রশীদ জামীল

আহাফি

অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি

চার ইমামের ইখতিলাফ. কে ভুল কে শুদ্ধ? সহিহ হাদিস কাকে বলে?

ইমাম মানতে হবে কেনো? শয়তান/খান্নাস

আহলে সুন্নাত : আহলে হাদিস তাকলিদ

সাহাবিরা কোন মাজহাব মানতেন? ইমাম

ইন্টারনেটে শায়খ

মাজহাব শয়তানের কূটনীতি

প্রথম মাজহাব নবীর সামগ্রি উত্তরসূরি

বুখারি তুমি কার?

—তুমি কি আসল আহলে হাদিস, নাকি দু...

—অবশ্যই আসল আহলে হাদিস।

—আচ্ছা! তাহলে বলো দেখি, ইলমে হাদিসের উসুল কী?

—উসুল মানে কী?

—'বাবা! তুমি উসুল মানেই জানো না; অথচ দাবি করছ আহলে হাদিস'—এখনই এই কথা বলে তাকে ভাগিয়ে দেওয়ার দরকার নাই। তাকে বলুন, উসুল মানে মূলনীতি। এবার বলো, হাদিসশাস্ত্রের মূলনীতি কী?

—আমি জানি না।

—আচ্ছা বলো, হাদিস মোট কত প্রকার?

—আমি জানি না।

—সমস্যা নাই। সবকথা সবাই জানেও না। হাদিস যাঁরা শেখান, তাঁদের মুহাদ্দিস বলা হয়—এটা জানো তো?

—হ্যাঁ, কেন জানব না?

—গুড, মুহাদ্দিসিনের তবকা কয়টি?

—তবকা কী?

—তবকা মানে স্তর। তাঁদের স্তর কয়টি?

—আমি জানি না।

এবার তাকে অতি মোলায়েম সুরে বলুন, 'ও মামা! তুমি তো হাদিসশাস্ত্রের কিছুই জানো না। তাহলে নিজেকে তুমি আহলে হাদিস বলছ কোন দুক্কে? তুমি তো দেখি মোটেও আসল আহলে হাদিস না; পুরাই দুই নম্বরি...

একটি মানবশিশুর জন্মের পর থেকেই তাকলিদ শুরু হয়ে যায়। সবাই বিষয়টি জানি; কিন্তু সেভাবে ভেবে দেখিনি বলে চোখে পড়ে না। একটু যখন বয়স হয়, দেড় কি দুই বছর—বাবাকে 'বাবা' বলে ডাকতে শুরু করি। তিনি যে বাবা, এটা আমরা আমাদের মায়ের কাছ থেকে জানি। মা আমাদের বলেন—'এটা তোর বাবা'। আমরা মায়ের কথায় আস্থা রাখি। আমরা আমাদের মায়ের কথা মেনে নিই। এই মেনে নেওয়াকেই আরবিতে বলে 'তাকলিদ'।

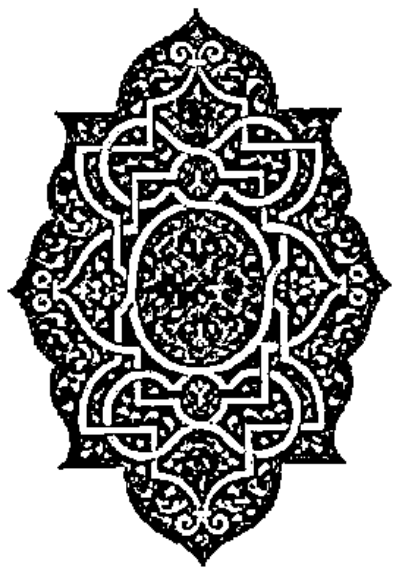

রশীদ জামীল

আহাফি

আহাফি

রশীদ জামীল

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০২৩

© : লেখক

মূল্য : ৳ ২৮০, US $ 13. UK £ 10

প্রচ্ছদ : নওশিন আজাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96950-8-0

Ahafi
by **Rashid Jamil**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
fb.com/kalantorprokashonisyl
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

স্ক্রিপ্ট তৈরি করে পড়তে দিলাম তাঁকে। তিনি বললেন, ইটস ইনাফ, এর বাইরে আর কিছু বলার আছে বলে মনে হচ্ছে না। আমি বললাম, বিশেষ কোনো পরামর্শ? বললেন, লেখককে তার নিজের মতো করেই বলতে দিতে হয়। একজন লেখকের প্রথম চাহিদা এটাই। আমি মনে মনে বললাম, শেষ চাহিদাও!

আহমাদ আবু সুফিয়ান, ইমাম ও খতিব, মদিনা মসজিদ, ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক।

গলায় গামছা বেঁধে কীভাবে লেখা আদায় করতে লাগে, কেউ শিখতে চাইলে তাঁর কাছ থেকে শিখতে পারে। মানুষটি পেছনে থেকে নিয়মিত ধাক্কাধাক্কি না করলে এ বিষয়ে লিখা হতো না। সম্পাদক এবং লেখক; কোনটিতে তিনি এগিয়ে আমি জানি না। সুযোগ পাচ্ছি না কারণ, লিখেন কম। যদি লিখতেন, যাদের পেছনে লেখার জন্য লেগে থাকেন, আমি নিশ্চিত, তাদের অনেকের চেয়ে ভালো লিখতেন।

মুনির আহমদ, নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক মুঈনুল ইসলাম।

অলস হিশেবে কিছুটা সুনাম তো আমার আছেই, তাঁর কারণে অলসতাটা আরও বেড়ে যায় মাঝেমধ্যে। ইলমি সাবজেক্টে আমার যখন রেফারেন্স লাগে, নিজে ঘাঁটাঘাঁটিতে না যেয়ে আমি তাঁকেই ডাক দিই। অনলাইনের ওপর তো আর ভরসা রাখা যায় না। এই বইয়ের রেফারেন্সগুলো কাগুজে কিতাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার কাজটি তাকেই করে দিতে হলো। কোনো কারণ ছাড়াই আমার প্রতি তাঁর একটা দুর্বলতা টের পাই আমি। ছোটভাইদের শ্রদ্ধা জানানোর সামাজিক রেওয়াজটা চালু হওয়া দরকার।

নোমান আহমদ, শিক্ষক, জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া কাজিরবাজার, সিলেট।

লেখা কনভার্টিং যে কী ঝামেলার কাজ, যারা জানে শুধু তারাই জানে। যে জানে না তাকে বলে বোঝানো যাবে না। এসব কাজ তাকে দিয়ে করানোর আগে ফ্যামিলিগত জরুরি কিছু বলার থাকলে আমাকে বলে নিতে হয় কারণ, যে কাজ ছয়দিনেও শেষ করা সম্ভব না, সে বলবে তিনদিনেই করে দিচ্ছি এবং অবধারিতভাবেই চতুর্থ দিন থেকে

তাকে আর ফোনে পাওয়া যাবে না। অষ্টম বা নবম রজনীতে ফাইল ইমেইল করে মোবাইলে আস্তে করে একটা টেক্স পাঠাবে, ফাইল পাঠিয়ে দিয়েছি!

হুসাইন আহমদ মিসবাহ, আমার অনুজ।

জাজাহুমুল্লাহ খাইর, আহসানাল জাজা, ফিদ-দারাইন।

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, *আহাফির* এটি তৃতীয় সংস্করণ ও পঞ্চম মুদ্রণ। আমরা মনে করি এটি কবুলিয়্যাতের আলামত। পাঠকরা ভালোবেসে বইটি গ্রহণ করেছেন। নিজে পড়ছেন, অন্যকে পড়তে সাজেস্ট করছেন। সবচেয়ে ভালোলাগার ব্যাপার হলো, হজরত আলিমগণের কাছে *আহাফির* গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া। সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

আহাফি দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে প্রকাশের দায়িত্ব কালান্তর প্রকাশনী নিয়েছে। এ হিশেবে পঞ্চম মুদ্রণও কালান্তর প্রকাশনী বের করল।

এই সংস্করণে বইটিকে একেবারে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় রেফারেন্স যুক্ত করা হয়েছে। বানানগত ত্রুটিগুলো যথাসম্ভব দূর করা হয়েছে। লেখার সেটিং পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। ফন্ট চেঞ্জ করা হয়েছে। বইয়ের কাগজ-বাঁধাই ইত্যাদি উন্নত করা হয়েছে। এদিকে প্রিন্টিং সামগ্রীর মূল্য বেড়ে যাওয়া এবং এসব কারণে বইয়ের মূল্যও কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। আশাকরি সম্মানিত পাঠক বিষয়টি বিবেচনায় নেবেন।

বইটিতে কালান্তরের নিজস্ব ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। যুক্তাক্ষরগুলো পাঠকের কাছে কিছুটা ব্যতিক্রম মনে হতে পারে। তবে ভালো লাগবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। বেশ কিছু যুক্তাক্ষর আমরা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি—কোন কোন অক্ষর মিলে কোন শব্দ হয়েছে। এতে পাঠক শুদ্ধ বানান ও উচ্চারণ সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন।

আল্লাহপাক বইটির লেখক, পাঠক, প্রকাশক, পরিবেশক সবার জন্য দুনিয়াতে হেদায়াতের এবং আখেরাতে নাজাতের জরিয়া হিশেবে কবুল করে নিন। আমিন।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রথম প্রকাশের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

উপনিবেশবাদ-উত্তর বিশ্বমানচিত্রে অর্ধশত মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম হলেও রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কোনোভাবেই স্বাধীন হতে পারেনি দেশগুলো। হতে দেওয়া হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে সন্ত্রস্ত মুসলমান নিজস্ব তাহজিব-তামাদ্দুন ছেড়ে অনৈসলামিক সংস্কৃতিকে নিজের করে নিয়েছিল। তবে হিজাজের কিছু অংশ এবং ভারতীয় উপমহাদেশ ছিল এর ব্যতিক্রম। শত জুলুমের মুখেও সেখানকার মুসলিমরা দেশপ্রীতির প্রশ্নে ছিল অনড়, নৈতিকতার রীতিতে অদম্য, ধর্মীয় নীতিতে আপসহীন।

বাস্তবতা সাক্ষী। 'আল কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ' সূত্রে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী সবসময়ই মুসলিমদের মধ্যে উদারপন্থি, চরমপন্থি, উগ্রপন্থি, মধ্যপন্থি; নানা রকমের পন্থি আবিষ্কার করে মুসলিমদের বিরোধে জড়িয়ে রাখে। তাদের ফ্যাক্টরিতে ধোলাইকৃত মগজ নিয়ে কিছু মুসলমান লেগে যান অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজিতে।

সাতচল্লিশ-পূর্ব ভারতীয় উপমহাদেশের পৃষ্ঠা উলটালে দেখা যায়, সে সময় মুসলিমদের সাইজ করার জন্য কাদিয়ানি, লা-মাজহাবি এবং মাজারপুজারী, এই তিন দলকে ভরণ-পোষণ দিয়ে লালনপালন করা হচ্ছিল। সাতচল্লিশে প্রভুরা লেজ গুটিয়ে পালালেও উচ্ছিষ্টভোজিরা মিশন থেকে সরে আসেনি। ফলে সরলপ্রাণ মুসলিমরা তাদের খপ্পর থেকে কখনো বেরিয়ে আসতে পারে না!

দুই. সময়ের চাহিদা ছিল মুসলিমদের ইমান আকিদা ও আমাল ঠিক করে দেওয়ার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে দাওয়াত ও ইসলাহের মেহনত শুরু করা। আলিমরা সেদিকেই মনোনিবেশ করলেন। রোদ-বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চষে বেড়াতে লাগলেন তাঁরা। গড়ে উঠতে লাগল দীনি প্রতিষ্ঠানসমূহ। পাশাপাশি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হলো। বিগত অর্ধশতকে মুসলিমরা যেটুকুন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, ধর্মীয় ফিরকাবাজ সম্প্রদায় থেকে সাধারণ মুসলমানদের আকিদা রক্ষা করতে পেরেছেন, সেটা ওই সকল নিবেদিতপ্রাণ আলিমরা তথা উলামায়ে দেওবন্দেরই ইখলাসওয়ালা মেহনতের ফসল।

তিন. নতুন শতাব্দীকে বলা হচ্ছে প্রযুক্তির শতাব্দী। ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং মিডিয়ার সুবাদে নতুন সাজে পুরাতন এজেন্ডা বাস্তবায়নে ধর্মীয় ফিরকাবাজি উসকে দিচ্ছে কিছু লোক। এই কিছুদিন আগেও মুসলমানরা যখন মসজিদে নামাজে দাঁড়িয়েছেন, তখন ভুলে গেছেন বাইরের সব বিভেদ। কিন্তু আজ শুধু দুঃখ নয়; শঙ্কার সঙ্গে লক্ষ করছি, তথাকথিত সহিহ(!) আন্দোলনের কবলে পড়ে মুসলিমদের ঐক্যের প্রতীক নামাজসহ অন্যান্য ইবাদতও অনৈক্যের মহা-সম্মিলন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের সহিহ(!) আন্দোলনের শিকার সরলপ্রাণ তরুণসমাজ। লা-মাজহাবি সহিহ(!) আন্দোলনের কারণে আজ নামাজের কাতারে কাতারে ঝগড়া, ইমাম-মুসল্লিদের মধ্যে তর্ক, স্বামী-স্ত্রীতে বিবাদ এবং ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যেও সংঘাত!

সহিহওয়ালাদের এই অপপ্রচারের কবল থেকে মুসলিমদের ইমান-আকিদা রক্ষার জন্য আলিমরাসহ দলমত নির্বিশেষে সবাই এখন সচেতন হচ্ছেন। আলিমদের পক্ষ থেকে যথাযথ জবাবও দেওয়া হচ্ছে; কিন্তু ইসলামি বিধিবিধান-সংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলো সহজ-সরল উপস্থাপনের মাধ্যমে সাধারণ মুসলিমদের উপযোগী করে রেফারেন্সসহ একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাব ছিল। এই ঘাটতি পূরণে এগিয়ে এলেন কথাসাহিত্যিক রশীদ জামীল। যারা রশীদ জামীলকে পাঠ করেন, তারা আমার সঙ্গে একমত হবেন, লেখক সাধারণত সাধারণ লাইনেই লেখালিখি করে থাকেন। আমাদের অনুরোধে তিনি তাঁর লেখালিখির নিজস্ব ধারা থেকে একটু দূরে সরে এসে; অথবা বলব, মূলের একটু কাছে চলে এসে একমাস পরিশ্রম করে বইটি লিখলেন। এ পর্যন্ত তাঁর ৩৭টি গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও আমার বিশ্বাস, এ বইটিও তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী একটি সৃষ্টি হিশেবে মূল্যায়িত হবে।

বিভ্রান্ত মুসলিমদের জন্য বইটি হিদায়াতের জরিয়া হোক। আল্লাহ লেখককে দীনের লেখক হিশেবে কবুল করুন।

আহমাদ আবু সুফিয়ান
নিউ ইয়র্ক
ফেব্রুয়ারি- ১৭, ২০১৬

সূচিপত্র

কথামুখ : ১৩
ভিশন যখন মিশনে : ১৭
পটভূমি : ১৯
আহলুল্লাহ : আহলুশ-শয়তান : ২৪
মোল্লা এবং লিল্লাহ : ২৪
নবিগণের ডিউটি : ২৫
নবিজির বাবা-মা কি জান্নাতি : ২৬
বেমারি : ২৬
শয়তানিক উপদল : ২৭
শয়তানের কর্মনীতি : ২৮
আল্লাহ মানি, কেমন মানা : ৩১
আহলে সুন্নাত আহলে হাদিস : ৩৭
আহলে হাদিস এবং আহাফি : ৩৯
জন্মনিমন্ত্রণ ও নামকরণ : ৪২
দোষে-গুণে সাহাবি : ৪৫
কাছের কুরআন, দূরের কিতাব : ৪৭
মুআবিয়া রা. : ৪৮
কালাম, কুরআন, কিতাব : ৪৯
তাকলিদ বা অনুসরণ : ৫১
ইজমা কিয়াস আবার কেন : ৫৩
হাদিস মানি, কোন হাদিস : ৫৫
চার খলিফার চার ফয়সালা : ৫৫
ইমাম মানব কেন : ৫৯
ইমাম না মানলে দীন মানার উপায় নেই : ৬১
সব মাসআলা কুরআন-হাদিসে থাকে না : ৬২
কুরআন-হাদিসেই সবকিছু দিয়ে দিলে... : ৬৪
সরাসরি কুরআন-হাদিসে নেই—উদাহরণ : ৬৫
চাঁদ দেখা : ৬৬
ইমাম যদি সিদ্ধান্ত দিতে ভুল করেন : ৬৬

ছায়া হাদিস : ৬৭
তাকলিদ কাকে বলে, কারা করে : ৬৯
তাকলিদের দলিল : ৭০
তাকলিদে শাখসি : ৭৩
মুজতাহিদ সাহাবি : ৭৫
তাকলিদ কেমন মাসআলায় : ৭৬
আহকামে শরইয়্যাহ : ৭৮
মাসায়িলে গায়রে মানসুসাহ : ৭৮
মাসায়িলে মানসুসাহ মুজতামিলাহ : ৮১
মাসায়িলে মানসুসাহ মুতাআরিজাহ : ৮১
মাসায়িলে মানসুসাহ মুহতামিলাতুল মাআনি : ৮৩
মাসায়িলে মানসুসাহ গায়র মুতাআইয়্যিনাতুল আহকাম : ৮৩
তাকলিদ নিয়ে অভিযোগ : ৮৫
তরকে তাকলিদের পরিণাম : ৮৯
আলিফ থেকে ইয়া সমাচার : ৯০
পরিণাম : ৯১
কবরে সাইজিং : ৯২
শেষ বিচারের শেষে : ৯৩
তাকলিদের অপরিহার্যতা : ৯৩
মাজহাব মানে কি অন্ধবিশ্বাস : ৯৮
মাজহাব মানতে হবে কেন : ১০০
সাহাবিরা কোন মাজহাব মানতেন : ১০০
চার ইমামের ইখতিলাফ, কে ভুল কে শুদ্ধ : ১০১
চার ইমামে ইখতিলাফ কেন : ১০২
একাধিক মাজহাব মানলে সমস্যা কী : ১০৩
রোগীর কথা বলি : ১০৪
পঞ্চম মাজহাব : ১০৬
নেকাবের পেছনের চেহারা : ১০৮
হালালজাদা হারামজাদা : ১০৮
আবু হানিফা ও বুখারি : ১১০
ওয়ালায়াতে আবু হানিফা : ১১১
দূরদর্শী আবু হানিফা : ১১৬
ইমামের স্পষ্টবাদিতা : ১১৭
আবু হানিফা নামকরণ : ১১৮

জেবুননেসা আলমগির : ১১৯
আবু হানিফা কেন আবু হানিফা : ১২৪
ইমামের ইনতেকাল : ১২৬
বুখারি তুমি কার : ১২৭
বুখারি ও কুফা : ১২৮
কুফার প্রতি ইমাম বুখারির কেন ছিল এই টান : ১২৮
পছন্দের প্রিয়তা : ১২৯
বুখারির সঙ্গে কারা : ১৩০
বুখারি ও ফাজায়েলে আমাল : ১৩০
যে ব্যাপারগুলো আলোচনায় আসতে পারে : ১৩১
বাবার মেয়ে : ১৩৩
সহিহ হাদিস কাকে বলে : ১৩৫
নবির নামাজ : ১৩৭
হাদিসের ভিন্নতার কারণ : ১৩৮
ইমামগণের ইখতিলাফ : ১৩৮
আহাফিদের অপপ্রচার : ১৩৯
নিয়ত : ১৪০
হাত বাঁধা : ১৪১
দাঁড়ানো : ১৪২
'আমিন' বলা : ১৪৩
'আমিন' আসলে কী : ১৪৫
তারকে কিরাআত খালফাল ইমাম : ১৪৭
সুরা ফাতিহা কি কুরআনের অন্তর্ভুক্ত : ১৪৭
নবির হাদিস; ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয় না : ১৪৮
ফাতিহা-খাদক : ১৫০
সালাতুন নবি, ইমামুল আম্বিয়া : ১৫১
বিতরের নামাজ : ১৫১
তারাবিহ : ১৫২
তারাবিহ কত রাকআত : ১৫৪
আট রাকআতকে তারাবিই বলা যাবে না : ১৫৫
রাফে-ইয়াদাইন : ১৫৬
আহাফিদের বেআদবি : ১৬০
গাধা সমাচার : ১৬২
গ্রন্থপঞ্জি : ১৬৬

কথামুখ

'এবার আমি অবসরে যাব'।

কথাটা বলেই লম্বা একটা হাই তোলে—ঘুম থেকে ওঠার পর মানুষ যেভাবে আড়মুড়ি দেয়, ঠিক সেভাবে একটা আড়মুড়ি দিলেন তিনি। সঙ্গী-সাথিরা কৌতূহল নিয়ে তাকালো তার দিকে! কেউ কিছুই বুঝতে পারছে না। হঠাৎ লিডার এভাবে কেন বলছেন, কারণ খুঁজে পাচ্ছে না তারা। ঘটনা কী!

ঘটনা হচ্ছে...

ঘটনার আগে ছোট্ট করে মূল ভাবটি বলে ফেলি, যে কারণে আয়োজন।

'মিথ্যা ততক্ষণ বলতে থাকো, যতক্ষণ লোকে এটাকে সত্য হিশেবে ধরে না নেয়'—বলেছিলেন নেপোলিয়ন। পৃথিবীতে শয়তানের চেয়ে বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ কোনো আলিম আছেন কি না আমার জানা নেই। নামের সঙ্গে হাদিস জড়ানো বিবেকের খতনা করানো দাব্বাতুল-ইন্টারনেটরা হাদিসের নামে মায়াকান্নায় ঘেমে অস্থির করে তুলেছে আকিদার অস্থিগুলো। 'ভিক্ষা চাই না মাগো কুত্তা সামলাও' অবস্থা।

উপরের তিন গুণ(!) একই অঙ্গে ধারণ করে কিছু লোক যখন অনবরত মিথ্যা বলে বলে মানুষের বিশ্বাসকে বিভ্রান্ত করছে, তখন সহজ সত্যটা সামনে তুলে ধরা দরকার। ভাব শেষ, এবার ভাব সম্প্রসারণ।

শুরুতে যে ভদ্রলোক হাই তুলছিলেন, তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। তার আসল নাম ইবলিস, নিক নেইম শয়তান। ওয়েল-নউন পার্সোনালিটি! বিশাল ক্ষমতাধর। মানুষকে কান ধরে উঠবস করানো তার বাঁ-হাতকা খেল!

শয়তান খুব অস্থির হয়ে উঠল একসময়! দিনের পর দিন মেহনত করে একটা লোককে সাইজে আনতে হয়। তারপর নাকে-মুখে-কানে কতো ফুঁ-ফা দেওয়ার পর তবেই তাকে দিয়ে একটা কু-কাম করানো যায়। আর লোকটি কিনা রাতে ঘুম থেকে উঠে 'মালিক, ভুল করে ফেলেছি, আর করব না, মাফ করে দাও' বলে ফুসফুস করে কান্দে। আর আল্লাহ-ও বলেন, 'আচ্ছা যা, দিলাম মাফ করে; কিন্তু আর করবি না' কথাটা মনে থাকে যেন'... কোনো কথা হলো!

শয়তান তার অ্যাসিস্ট্যান্টদের জড়ো করে বলল, আজ থেকে আমাদের কর্মকৌশল পালটে যাবে। কাজ আগেরটাই করব তবে সেটা করব ভিন্নভাবে। গুণীজনেরা ভিন্নকাজ করেন না, তারা একই কাজ ভিন্নভাবে করেন।

সবাই কৌতূহল নিয়ে তাকালো তার দিকে। কৌতূহলী হলেও লিডারের প্রতি তাদের আস্থা আছে। তারা জানে লিডার যা করবেন, শয়তান-সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্যই করবেন। শয়তান বলল,

—তোমরা কি লক্ষ করেছ আমাদের কাজের আলটিমেট রেজাল্ট কী আসছে?

—কথাটি আমরা বুঝতে পারছি না বস।

—বুঝতে না পারার তো কিছু নেই। এই যে সারাদিন পরিশ্রম করে মানুষকে দিয়ে আকাম-কুকাম করাও, তারপর কী হয় খবর রাখো?

সবাই চুপ করে রইল। লিডারের মুখের ওপর কথা বলতে ভয় পায় তারা। বুড়োমতন একজন গলা খাকারি দিয়ে বলল,

—কিছু মনে করবেন না বস, আপনি আমাদেরকে আকাম করানোর ডিউটি দিয়েছেন, আকাম করার পর সেই লোক কী করে, সেটার খবর রাখার ডিউটি আমাদের দেননি!

—হুম। তুমি ঠিক বলেছ। এই ডিউটি আমি তোমাদের দিইনি তবে আমাকে সব খবর রাখতে হয়। আমি যেমন তোমাদের কাজের আউটপুট সংগ্রহ করি, ঠিক সেভাবে যাকে তোমরা আকামে লাগিয়ে এসেছ, তারও খবর আমাকে রাখতে হয়। শয়তান-সাম্রাজ্য পরিচালনা তো আর এত সহজ না। যাক, ব্যাপার হলো, তোমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় যেসব মানুষকে আমি উলটা-পালটা কামে লাগাই, সেই বদগুলো কী করে জানো?

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'কী?'

—কান্নাকাটি শুরু করে দেয়... 'আল্লাগো, গোনাহ করে ফেলেছি, ভুল করে ফেলেছিগো আল্লাহ, আর করব না, মাফ করে দাও।' আর আল্লাহও মাফ করে দেন। তার মানে আমাদের বাড়া ভাতে ছাই, পরিশ্রম পণ্ড। বুঝতে পারছ আমি কী বলছি?

—জি বস।

—চিন্তার বিষয়। এটা তো হতে দেওয়া যায় না।

—অবশ্যই না।

—আমাদেরকে এখন টেকনিক পালটাতে হবে।

—অবশ্যই পালটাতে হবে।

—এমনভাবে কাজ করতে হবে, যাতে আল্লাহ আর মাফ করে না দেন।

—কিন্তু বস, আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ তো মাফ করেই দেবেন।

—যদি মাফ-ই না চায়?

—মাফ তো চাইবেই...

শয়তানের মুখে বিকট হাসিরেখা চিত্রিত হলো। সে তার নিকষ-কালো কুশ্রী ঠোঁট-দুটো বাঁকা করে বলল,

—আমি কতবড় ত্যাদড় সেটা তোমরাও জানো না। এমন চাল চালব, পাবলিক গোনাহ করবে আবার আল্লাহর কাছে মাফও চাইবে না। কারণ, সে বুঝতেই পারবে না কাজটি গোনাহর ছিল। তোমরা কি কখনো কৃমির ট্যাবলেট দেখেছ?

—এটা আবার কী লিডার?

—তোমাদের অবশ্য চেনার কথাও না। মানুষের বাচ্চাদের পেটে মাঝেমধ্যে লম্বাটে ধরণের কিছু পোকার জন্ম হয়। এগুলোর নাম হলো কৃমি। সেগুলোকে মারার জন্য একপ্রকার ট্যাবলেট আছে। ট্যাবলেটটি খেতে খুবই বিস্বাদ এবং দেখতেও বিদঘুটে। বাচ্চারা খেতে চায় না। তখন বাচ্চার মা কী করেন জানো?

—কী করেন?

—ট্যাবলেটের চতুর্দিকে গুড়ের প্রলেপ মাখিয়ে খাইয়ে দেন। বাচ্চারা মজা করে খেয়ে ফেলে। ব্যস, কাজ হয়ে গেল। কিছু কি বুঝতে পারলে?

—জি, কিছুটা।

—কিছুটা বুঝলে তো হবে না, পুরোটা বুঝতে হবে। মানুষ কিছুটা বুঝে আর বাকিটা না বুঝেই লাফায়। তোমরা তো মানুষ না, তোমরা হলে শয়তান। তোমাদের মধ্যে মানুষের বদ খাসলত চলে আসল কবে থেকে? বুঝিয়ে বলছি শোনো। এখন থেকে আমাদের কাজের ধরণ হবে মানুষকে আমরা আকাম-কুকাম করাব ঠিকই, তবে সেটা করাব গুড়ের প্রলেপ মাখিয়ে, কৃমির ট্যাবলেটের মতো। গোনাহের কাজগুলোকে আমরা তাদের সামনে তুলে ধরব নেকির কাজ হিশেবে। তারা সেগুলো নেকি ভেবেই করবে। যেহেতু কাজটি যে গোনাহের, এটা তারা বুঝবেই না, তাই তাওবা করার প্রশ্নই আসে না। ইজ ইট ক্লিয়ার?

—ইয়েস স্যার!

—থ্যাংক য়্যু। এখন যাও, নতুন ফর্মুলায় কাজে নেমে পড়। আমার আশীর্বাদ তোমাদের সঙ্গেই থাকবে।

এটি ছিল কয়েক হাজার বছর আগের কথা। শয়তানের এই মিটিংটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ

প্রমাণিত হলো। দেখা গেল—

- মানুষ মসজিদ ছেড়ে মাজারমুখো হয়ে গেছে। মসজিদে এসে আল্লাহর কাছে না চেয়ে মাজারে গিয়ে বাবার কাছে চাইছে।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান করার নামে তাঁকে আল্লাহর সমান করে নিচ্ছে!
- কিছুদিন পরপর রঙ-বেরঙের মনগড়া ইবাদত আবিষ্কার করছে।

শয়তান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

তবে শয়তানের অবসরে যাওয়ার ঘোষণাটি অতি সাম্প্রতিক। সামসময়িক বিশ্বের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে সে তার অভিলাষ প্রকাশ করার জন্য জরুরি সাধারণ সভার আয়োজন করেছিল। ঘোষণাটি দেওয়ার আগে পুরো প্রেক্ষাপট তুলে ধরল সে। বলল,

—দেখো, আমাদের জন্য মূল সমস্যা ছিল তাওহিদবাদীরা। অর্থাৎ, যারা আল্লাহকে এক মেনে সহিহ আকিদায় সঠিকভাবে ইবাদত করবে, তারাই ছিল আমাদের জন্য সমস্যা। আর বুঝতেই পারছ আমি মুসলমানদের কথাই বলছি। এতদিন ছলে-বলে-কৌশলে আমরা আমাদের কাজ সিদ্ধি করিয়েছি; কিন্তু আজ আমি তোমাদের অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ইতিমধ্যেই মানুষের মাঝে আমি আমার এমন কিছু শাগরেদ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি, যারা এখন আমার হয়ে কাজ করে দিচ্ছে। এরা মুসলমানদেরকে সহিহ-গলদের ভেলকি লাগিয়ে এমনভাবে সাইজ করছে যে, আমি নিজেই সেভাবে করতে পারিনি। তাই আমি খণ্ডকালীন অবসরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তোমাদেরকেও কিছুদিনের জন্য ছুটি দেওয়া হলো। যাও, রিলাক্স করো। আবার যখন দরকার হবে ডাকব। ঠিকাছে?

—জি মালিক, ঠিকাছে।

'শয়তানের জয় হোক, শয়তানের জয় হোক' স্লোগান দিতে দিতে সভাস্থল ত্যাগ করল সবাই। ঠিক আগের মতোই আরেকবার হাই তুলল সে।

শয়তান কাহিনি শেষ। উপরে বর্ণিত কাহিনির রেফারেন্স চাইবার দরকার নেই কারণ, কথাগুলো সম্পূর্ণই আমার বানানো। তবে কথা বানানো হলেও বাস্তবতা বানানো নয়। আমি নিশ্চিত, শয়তানের মজলিসে এভাবেই কিছু একটা হয়ে থাকবে। এমনটি আমার কেন মনে হচ্ছে, ব্যাখ্যা করছি। ব্যাখ্যা করার পর যদি আপনারও তাই মনে হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত পড়ুন। আর তেমনটি মনে না হলে ওখানেই থেমে যান, খামাখা সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

ভিশন যখন মিশনে

আকিদার ওপর অপারেশনের কাজটা আজকাল খুব নিপুণভাবেই করা হচ্ছে। সূত্র সেটাই, সূত্র সেই আগেরটাই, সাপ মারতে হবে মাগার লাঠি ভাঙা যাবে না। যে সূত্রের উৎস হলো ইন্নি *লাকুমা লামিনান না-সিহিন*।

- মুসলমানকে যদি বলা হয়, রোজা-রমজানের দিন, সারাদিন কষ্ট করে রোজা রাখার পর রাতে আর তারাবিহ পড়ার দরকার নেই, মুসলমান সেটা মানবে না। অতএব, তাহাজ্জুদকে তারাবিহ বানিয়ে তাদের হাতে ধরিয়ে দাও। তারাবিহ ভেবে তারা তাহাজ্জুদেই সন্তুষ্ট থাকল; অন্যদিকে তারাবিহ না পড়ার গোনাহটাও ঘাড়ে থাকল।

- 'জুমআর আগে চার রাকআত সুন্নাত আর পড়ো না' বললে লোকে শুনবে না। অতএব, হাদিসের আশ্রয় নাও, মনগড়া ব্যাখ্যাসহ তাদেরকে বোঝাও জুমআর আগে কোনো সুন্নাত নেই, ব্যস।

- শবেবরাতে মানুষ সারারাত ইবাদত-বন্দেগি করে কাটাবে, সারা বছরের গোনাহ মাফ হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকবে, এটা তো মেনে নেওয়া যায় না! এখন 'শবেবরাতে মসজিদে যেয়ো না, ইবাদত করো না' বললে তো মানুষ এ কথা মানবে না। অতএব প্রচার করো, শবেবরাতের পক্ষের হাদিস দুর্বল! শবেবরাতের প্রতি মানুষের দুর্বলতাও কমে যাবে।

- এক শবেকদর পেয়ে কাজে লাগিয়ে দিতে পারলে ৮৩ বছর ৪ মাস থেকেও বেশি লাভ। এতবড় কাজ তো মুসলমানকে কোনো অবস্থাতেই করতে দেওয়া যায় না। তাহলে কী করতে হবে? সোজা পথ, ঘোষণা করে দাও ইসলামে বিশেষ দিবস পালনের বিধান যেহেতু নেই। অতএব, শবেকদর বলে কোনো রাতকে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে সে রাতে ইবাদত করা ঠিক না। উপরন্তু যেখানে শবেকদর নির্দিষ্টও না।

- ‘নফল ইবাদত করার দরকার নেই’ বললে লোকে সেটা মানবে না। তাহলে কী করতে হবে? নফলের পক্ষে যতগুলো হাদিস পাও, চাঁপার জোরে সবগুলোকে দুর্বল বলে প্রচার করতে থাকো। মানুষ এমনিতেই ছেড়ে দেবে।
- ফরজ নামাজের পর দুআ করলে দুআ কবুল হয় বেশি। এখন ‘নামাজের পর দুআ করা যাবে না’ বললে তো মানুষ মানবে না। তাহলে বলো, জামাআতে নামাজ পড়ার পর দুআ করার কোনো তরিকা নবির সুন্নাতে নেই। সুতরাং এটা বিদআত। মানুষ বিদআত থেকে দাঁত বাঁচানোর জন্য দুআ ছেড়ে দেবে।
- মুসাফাহা করলে গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। এত সহজে মানুষের গোনাহ মাফ হয়ে যাওয়া মেনে নেওয়া যায় না। আবার ‘মুসাহাফা করো না’ বললেও তো কাজ হবে না। অতএব, মুসাহাফাকে হ্যান্ডশেক বানিয়ে দু-হাত থেকে একহাতে নিয়ে আসো। একহাতে মুসাহাফার রেওয়াজ চালু করতে পারলে মানুষ মুসাহাফাও করল; আবার গোনাহও থাকল।

এভাবেই মুসলমানকে ইবাদত-বন্দেগি থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার মিশন নিয়ে কাজ চলছে এখন। যে কাজটি ছিল শয়তানের, সে কাজ এখন মানুষ করছে। যে কাজগুলো করার জন্য শয়তানকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হতো, পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়াতে হতো, সে কাজ এখন তার হয়ে তার মানব-শাগরেদরাই করে দিচ্ছে স্যাটেলাইটের কল্যাণে। তারা কাজ করছে নেপোলিয়নের সূত্রে, শয়তানি ফর্মুলায়।

পবিত্র কুরআনে কুরআন-হাদিস এবং উলামা-ফুকাহার অনুসরণ করতে বলে দেওয়ার পরও, অসংখ্য হাদিসে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়ে যাবার পরও, সারাবিশ্বের (প্রায়) সকল আলিম মাজহাবের ব্যাপারে ইজমায় থাকার পরও এই সময়ে এসে লা-মাজহাবিত্বের নামে মুসলমানদের ইমান-আকিদা ধ্বংসের মিশন নিয়ে মাঠে নেমেছে যারা, তাদের দেখে তো শয়তানের ইচ্ছা হতেই পারে অবসরে চলে যাওয়ার। অবাক হওয়ার কী আছে!

পটভূমি

বুঝতে চাইলে একলাইনেই বোঝা সম্ভব; আর না চাইলে রাতভর পুঁথি পড়লেও কাজ হবে না। ইমানের প্রশ্নে মুসলমানরা সুখে ছিল। আকিদার প্রশ্নে শান্তিতে ছিল। সন্তুষ্ট ছিল চার মাজহাব নিয়ে। গুটিকতেক লোক ছিলেন, তারা ছিলেন তাদের মতো। মাজহাব মানতেন না তাঁরা। কাউকে ডিস্টার্বও করতেন না। তাদের নাম ছিল উলামায়ে আহলে হাদিস। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণের সঙ্গে তাঁরা কখনো দ্বন্দ্বে জড়াননি। তাঁরা তাদের মতো করেই চলছিলেন। আমার মনে আছে মাদরাসায় উচ্চ মাধ্যমিকে যখন পড়তাম, আকাইদের ক্লাসে 'আহলে হক' অধ্যায়ে যাদেরকে আহলে হক হিশেবে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে এক প্রকারের নাম ছিল 'আহলে হাদিস'। তাঁরা তাঁদের জায়গায় শ্রদ্ধাসনেই থাকুন। আমাদের আলোচনা হাদিসের সাইনবোর্ড গলায় ঝুলিয়ে মুসলমানকে বিভ্রান্ত করে চলা শেয়াল পণ্ডিতদের নিয়ে।

সম্প্রতি লবণের পুষ্টিতে তুষ্টির তিতা ঢেকুর তুলে নিমকহালালির প্রজেক্ট নিয়ে মাঠে নেমেছে যারা, এদের উপদ্রবটা মূলত শুরু হয়েছে ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে, ইউটিউব নামের ভিডিও শেয়ারিং ওয়েবসাইট আন্তঃবাজারে আসার পর। ব্যাসিক্যালি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ এই গ্রুপটি ইনিয়ে-বিনিয়ে গলার রগ টানিয়ে এবং অতি-অবশ্যই হাদিসের নামে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে সাধারণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করা শুরু করে। এরা এখন সাধারণ মুসলমানকে পর্বতের মূষিক প্রসবের গল্প শোনায়! শোনাতে তাদের হয়ই। নুন দেশি হোক আর বিদেশি, খাইলে তো গুণ গাইতেই হয়। কাজের বিনিময়ে খাদ্য। কাজ না করলে সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে। বউ-বাচ্চা নিয়ে তখন খাবে কী!

এই সময়ের আহলে হাদিস ফিরকার নুনের সাপ্লাই কোথা থেকে আসছে, মোটামুটি একটা ধারণা করা গেলেও নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। আমরা অপেক্ষা করছি।

আহলে হাদিস ফিরকার (এর পরে আহলে হাদিস ফিরকা-কে সংক্ষিপ্ত করে 'আহাফি'

বলা হবে) অপপ্রচার বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যাওয়ার পর উলামায়ে আহলে সুন্নাত নড়েচড়ে উঠেছেন। তাদের অপপ্রচারের মাড়িভাঙা জবাব দিচ্ছেন। দালিলিক আলোচনা করছেন। হাদিস নিয়ে তাদের অপব্যাখ্যার জবাব দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে আমার অনুসন্ধানে সবচেয়ে বেশি গঠনমূলক এবং কার্যকর কাজ করছেন মুতাকাল্লিমে ইসলাম মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান হাফিজাহুল্লাহ। তাঁর কাজ আমার কাছে ভালোলাগার কারণ হলো, দলিল-জবাবের সঙ্গে যুক্তির ব্যবহার। আমার এই লেখার প্রেক্ষাপটে আমাকে যদি কারও কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলা হয়, আমি মাওলানা ইলিয়াস গুম্মানের নামই নেব। তাঁর বেশ কিছু যুক্তি আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। কয়েকটি যুক্তিকে আমি আমার মতো করে সাজিয়েও নিয়েছি।

আহাফি বিভ্রান্তির জবাবে বাংলাদেশ, নিউইয়র্ক এবং লন্ডন থেকে লিখিত অনেকগুলো বই আমার নজরে পড়েছে। আমি লক্ষ্য করেছি, দালিলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেকগুলোই বই মানোত্তীর্ণ হলেও সাধারণ মুসলমানদের জন্য সেগুলো যথেষ্ট নয়। সাধারণ মুসলমান কুরআন বুঝে, হাদিস বুঝে আর বুঝে যুক্তি। তাদের কাছে হাদিসের সনদ আর রেওয়ায়াতের কুউওয়াত-জু'ফ ব্যাখ্যা করার মানে হয় না। তাদের কাছে হাদিসের কিতাবাদি থেকে কপি করে করে মাজহাবের পক্ষের দলিলগুলো জড়ো করে মলাটবন্দি করে দিয়ে বই ছাপানোর মাঝে বাড়তি কোনো ফায়দা নেই। এগুলো এখন মুসলমানদের হাতের নাগালেই থাকে।

সাধারণ মুসলমানের সামনে কুরআন-হাদিস যৌক্তিকভাবে উপস্থাপিত হলে তাঁরা আর কিছু চায় না। আর ৩০ পারা কুরআন এবং বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ১০ লক্ষাধিক হাদিসের এমন একটি লাইনও নেই, আমি আবার বলি, এমন একটি লাইনও নেই যা অযৌক্তিক। একজন মানুষের সামনে যদি শুধু কুরআন এবং হাদিসকেই যুক্তির পোশাক পরিয়ে হাজির করা হয়, সে আর লাইনচ্যুত হবে না। কারণ, সে আবিষ্কার করবে ইজমা, কিয়াস, সাহাবি, তাবেয়ি, মুজতাহিদ ইমামগণ, ফিকাহ, মাজহাব সবকিছু কুরআন-হাদিসের ভেতরের মাল; অথচ এই কাজটি করতে আমরা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছি!

জানিয়ে দেওয়া ভালো, আমি হিসাবে গণ্য করার মতো কোনো আলিম নই। আমি বাংলা জগতের মানুষ। ইলম ও আকাইদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে লেখালেখি আমি করিনি বললেই হয়। আহাফি ফিতনা নিয়েও লিখতাম না। লিখছি তিন কারণে।

প্রথম কারণ

আগেই বলেছি বাজারে যে বইগুলো আছে, সেগুলোকে এত জটিল করে ফেলা হয়েছে যে, সাধারণ মুসলমানগণ সমাধানের জন্য এসে সমাধানের ভেতরে নতুন করে সমস্যায় পড়ে যায়। যে সমস্যা থেকেই আর বেরোতে পারে না। একসময় ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে খেই হারিয়ে ফেলে। আমজনতার জন্য লিখে সেখানে আকওয়ালে মুহাদ্দিসিন নিয়ে কচকচানি করে, সনদের দুর্বলতা-সবলতার লেবুকে চিপাচিপি করতে করতে যে পরিমাণ তিতা বানানো হয়, তাতে সাধারণ মুসলমানের অবস্থা দাঁড়ায় 'ছাইড়া দে মা কাইন্দা বাঁচি'র মতো। অবস্থা হয় ওই লোকের মতো—

এক লোক শাবান মাসের ২৯ তারিখ মাগরিবের নামাজ পড়তে পাড়ার মসজিদে গিয়েছিল। নামাজের পর ইমাম সাহেব ঘোষণা করলেন, 'রমজানের চাঁদ দেখা গেছে, আগামীকাল থেকে রোজা।' লোকটি তখন বলছিল, 'আইলাম ঘাড় থেকে নামাজ নামাইতে, এখন রোজা গলায় লাগল।' আহাফি ফিতনার জবাবে হানাফি অনেক আলিমের লেখা বা বক্তৃতাকেও আমার কাছে নামাজ ছাড়াতে আসা মানুষের গলায় রোজা ঝুলিয়ে দেওয়ার মতো মনে হয়। উদাহরণ দিই—

কোনো একটি মাসআলা নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি তাঁর জবাব দিচ্ছেন। জবাব দিতে গিয়ে বলছেন, 'এই হাদিসের সনদে অমুক রাবির ব্যাপারে কথা আছে, অমুক মুহাদ্দিস তাকে কাজ্জাব বলেছেন, তমুক মুহাদ্দিস বলেছেন দাজ্জাল। সুতরাং তার বর্ণিত হাদিস জয়িফ। এটি গ্রহণ করা যাবে না!' এখানে সমাধানের ভেতরে কতগুলো নতুন সমস্যা তৈরি করা হলো। এখন পাঠক বা শ্রোতাকে জানতে হবে :

- হাদিসের সনদ কাকে বলে?
- রাবির রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্তগুলো কী কী?
- কোন পর্যায়ের মুহাদ্দিস হলে সনদ নিয়ে কথা বলতে পারেন?
- যে মুহাদ্দিসগণের নাম বলা হলো, তাদের কার কী অবস্থান?
- হাদিসের এলাকায় কাজ্জাব মানে কী?
- দাজ্জাল কাকে বলে? এটা কোন পর্যায়ের দাজ্জালি?
- জয়িফ হাদিস কারে কয়? এটা কি গ্রহণযোগ্য?
- সর্বোপরি গ্রন্থটি কি অরিজিনাল নাকি ডুপ্লিকেট ছাপা?

একজন আলিম ১৬ বছর জেনারেল লাইনে মাদরাসায় পড়ালেখা করে দাওরায়ে হাদিস

কমপ্লিট করার পর আলাদাভাবে আরও তিন/চার বছর ফিকাহ ও হাদিস শাস্ত্রের বিশেষায়িত কোর্স শেষ করে এসেও যেখানে এসব বিষয়ে হাবডুবু খান, সেখানে একজন সাধারণ মুসলমান এসব বিষয় বুঝে ফেলবে—এই ধারণা আমাদের হয় কী করে?

কথা তো আরও আছে। মাঝেমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, বিশেষ কোনো হাদিস বর্ণনাকারীর ব্যাপারে দুজন মুহাদ্দিস সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে গেছেন। একজনের ভাষায় তিনি ইমামুল মুহাদ্দিসিন, অন্যজনের কাছে তিনি মিথ্যাবাদী! আবার দুজনের কাউকেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না কারণ, দুজনেই গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস।

এখন বলা হবে, আহাফিরা তো সহিহ হাদিস, জয়িফ হাদিস; এগুলো বলে বলে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। এদের মোকাবিলায় হাদিসের সনদ নিয়ে কথা না বললে কীভাবে হবে?

সহজ জবাব

এটাও তাদের একটি সফলতা। তারা যেভাবে চাইছে, আলিমগণকে সেভাবেই মাঠে নামিয়েছে। তারা শুধু তাদের ফর্মুলাই নয়, পরিভাষাও আমাদের মুখে তুলে দিতে পেরেছে। আমরা সেগুলোকে ইতমিনানের সঙ্গে চিবুচ্ছি! সাধারণ মুসলমানকে তারা সহিহ-জয়িফ ধোঁকায় ফেলে বিভ্রান্ত করছে। আমরা সেখান থেকে আমাদের মতো করে মানুষকে বের করে আনতে পারছি না! তাদের ধোঁকা থেকে বের করতে চাইছি তাদেরই ফর্মুলায়। কীভাবে সম্ভব?

দ্বিতীয় জবাব

দলিল-নির্ভর না হয়ে দলিল সামনে রেখে যুক্তি-নির্ভর হওয়া যায়। তারা সহিহ-জয়িফের মারপ্যাঁচ লাগিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করতে পারছে; এটা তাদের মার্কেটিং স্কিল। এটা তাদের যোগ্যতা। আমরা সাধারণ মুসলমানকে সাধারণভাবে বোঝাতে না পারলে স্বীকার করা উচিত এটা আমাদের ব্যর্থতা। কথাটি যদি আমরা মানি, তাহলে পরিভাষাকে যত সহজ করে উপস্থাপন করা সম্ভব, করা দরকার। পাবলিককে *সহিহাইন* বললে আলাদা করে বুঝিয়ে দিতে হয় *সহিহাইন* কাকে বলে। যেখানে একবাক্যে *বুখারি-মুসলিম* বলে দিলে বুঝতে এক সেকেন্ডও লাগত না। সাধারণ মানুষের কাছে শুধু কুরআন-হাদিসের দলিল উপস্থাপন করা দরকার। বাকি দলিলের মধ্যকার দালিলিক ব্যাপার-সেপার যেগুলো আছে, সেগুলো কারও জানার গরজ থাকলে তিনি আলিমগণের কাছে যাবেন। প্রশ্ন করে জানবেন।

দ্বিতীয় কারণ

বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের কিছু বন্ধুবান্ধব, যারা আমার প্রতি আন্তরিকতার

কারণে আমার যেকোনো লেখা বা বই পড়ে ফেলেন। আমার প্রতি তাদের পরামর্শ, 'সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে একটা বই দরকার। লিখে ফেলুন। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, এটা আলিমগণের সাবজেক্ট। দলিল-আদিল্লার ব্যাপার। আমি হাত দিলে কূল-কিনারা করে উঠতে পারব না। তারা বললেন, বাজারে যেসব বই-পুস্তক আছে, সেগুলো আলিম পাঠকের জন্য ঠিকাছে; কিন্তু সাধারণ পাঠক যারা, তাদের জন্য এগুলো পারফেক্ট না। আপনি এই পাঠকদের জন্যই লিখবেন।

আমি বলেছিলাম, আমাকেই বলছেন কেন?

তারা বললেন...

আচ্ছা থাক, সবকথা বলতে লাগলে কথা অনেক লম্বা হবে। যাদের অনুরোধে এই বই, বইয়ের ভাষায় একশব্দে 'বন্ধুবান্ধব' বলে ফেললেও কিছু আছেন বড়ভাই মতন। ছোটভাই পর্যায়েও আছে কেউ কেউ।

তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

তৃতীয় কারণ

দায়মুক্তি। লেখালেখি করছি। কতকিছু লিখছি। ভয়ে আছি কিয়ামতের দিন যদি জিজ্ঞাসিত হই। আল্লাহ যদি জিজ্ঞেস করেন, মানুষের আকিদা যখন নষ্ট করা হচ্ছিল তখন তুই কোথায় ছিলি? লেখতে লেখতে আঙুলে কড় বসিয়ে ফেললি; আর এই গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট নিয়ে লেখার সময় পেলি না তুই? তোর কাছে কি আমার নবির মাধ্যমে আমার সতর্কবার্তা পৌঁছায়নি—

ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.

সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে![১]

ভূমিকা শেষ। আর শেষের শুরুতে বলে রাখি, যেহেতু আমার এই বই 'জালিকাল কিতাব' নয়, সে জন্যে 'লা রাইবা ফিহ' বলার সাধ্যও আমার নেই। যেকোনো শ্রেণির ভুল কারও চোখে পড়লে জানিয়ে দিলে নিজেকে শুধরে নেব। পরের সংস্করণে ঠিক করে দেবো। আর ভুল করে ভুল ধরে কেউ ভুল করলে চেষ্টা করা হবে ভুল ভেঙে দিতে। ভুলের সঙ্গে বসবাস করা ঠিক না।

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৭১৩৮; *মুসলিম* : ১৮২৯।

আহলুল্লাহ : আহলুশ-শয়তান

সারা পৃথিবীতে দল এই দুটোই আছে। আহলুল্লাহ এবং আহলে শয়তান। তৃতীয় কোনো দল নেই। সাদা-কালো-বাদামি, হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান, ধনি-গরিব-যাযাবর, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য যত মানুষ আছে পৃথিবীতে, এই দুই শ্রেণির ভেতরেই আছে। হয়তো আছে আল্লাহর দলে আর না হয় শয়তানের দলে। এর বাইরে কেউ নেই। এখন দেখার বিষয় আল্লাহর দল কোনটি আর শয়তানের দল কোনটি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আদম আ. থেকে শুরু করে শেষনবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত অসংখ্য নবি-রাসুলকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীতে কী করতে হবে আর কী করতে হবে না। যারা নবিগণের কথামতো আল্লাহর কথা মানবেন, তাঁরা আছেন আল্লাহর দলে। আর যারা মানবে না, তারা শয়তানের দলে।

আল্লাহর দলে যেমন কিছু আছে সমর্থক আবার কিছু কর্মী, শয়তানের দলেও তাই। আল্লাহর দলের কর্মীদের নাম নবিগণ ও আলিমগণ; আর শয়তানের দলের কর্মীদের নাম খান্নাস, আল্লাজি য়্যু-উয়াস-উয়িসু ফি সুদুরিন-নাস! বুঝতেই পারছেন 'খান্নাস' নাম আমি দিইনি, দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। তারপরে আবার বলে দিয়েছেন, এরা যেমন জিনদের মধ্যে আছে, মানুষের মধ্যেও আছে।

মোল্লা এবং লিল্লাহ

এখানে স্বতন্ত্রভাবে একটি কথা বলতে ইচ্ছে করছে। অনেককেই বলতে শোনা যায়, 'মোল্লারা আছে লিল্লাহর উপরে। খালি লিল্লাহ খায় আর মসজিদে ঘুমায়। লিল্লাহ না খাইয়া যদি আমাদের মতো পরিশ্রমের কাজ করে খাইত, তাইলে বুঝত দুনিয়াটা এত সোজা না।'

আমি জানি কথাটি তারা না বুঝেই বলে। আমি বিশ্বাস করি এই লেখা যদি তাদের কেউ পড়ে যারা বলে, 'মোল্লারা লিল্লাহ খায়, আমরা লিল্লাহ খাই না।' তাহলে আজকের পর থেকে সবাই লিল্লাহ খাওয়া শুরু করতে চাইবে। ভুলেও আর 'লিল্লাহ খাই না' বলবে

না। কারণ, লিল্লাহ মানে আল্লাহর। লিশ-শায়তান মানে শয়তানের। 'আমি লিল্লাহ খাই না' মানে দাঁড়াল আমি আল্লাহর খাই না। তাহলে তুমি কার খাও বাবা? শয়তানের? আল্লাহর না খেলে শয়তানের খাওয়া ছাড়া তো উপায় থাকে না।

নবিগণের ডিউটি

কথা হচ্ছিল আল্লাহর দল আর শয়তানের দল নিয়ে। দল দুইটা হলেও প্রত্যেকটির মধ্যে উপদল আছে অনেকগুলো। কম কথায় সেগুলোর পরিচয় তুলে ধরে মূল আলোচনার দিকে যাওয়া যাক।

সকল যুগে আল্লাহ মনোনীত নবিগণ ছিলেন আল্লাহর দলের কমান্ডার ইন চিফ। দ্বিতীয় নবি শীষ আ. থেকে নিয়ে ইসা আ. পর্যন্ত সকল নবি-রাসুলগণ আল্লাহর বিধান ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি আরও দুটি কাজ করে গেছেন। তাঁদের প্রতি নির্দেশ ছিল তাঁরা যেন অবশ্যই কাজ দুটি করেন। কাজগুলো হলো সত্যায়িতি এবং সুসংবাদ দেওয়া। অর্থাৎ পূর্বেকার নবির সত্যতা স্বীকার করা এবং পরের নবির আগমনের ব্যাপারে সুসংবাদ দেওয়া। দুই কাজের কারণে কুরআন তাঁদেরকে দুটো নামও দিয়েছে, মুসাদ্দিক এবং মুবাশশির। মুসাদ্দিক মানে সত্যায়নকারী এবং মুবাশশির মানে সুসংবাদদাতা।

যেহেতু আদম আ. ছিলেন প্রথম নবি, তাঁর আগে মানুষের মধ্যে আর কোনো নবি ছিলেন না, তাই তিনি ছিলেন শুধুই মুবাশশির। আর মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষনবি হলেও, তাঁর পরে আর কোনো নবির জন্ম না হলেও তিনি মুসাদ্দিকও ছিলেন, মুবাশশিরও ছিলেন!

এই প্যারাগ্রাফ পড়ে যাদের মাথায় কয়েকটি প্রশ্ন ঘুরঘুর করতে শুরু করেছে, যারা হিসাব মিলাতে পারছেন না :

১. 'আদমের আগে আর নবি ছিলেন না' না-বলে 'মানুষের মধ্যে আর কোনো নবি ছিলেন না' বলার মানে কী?

২. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু শেষ নবি, তাহলে 'তাঁর পরে আর কোনো নবি আসবেন না' বললেই তো হতো; আর কোনো নবির 'জন্ম হবে না' বলার কারণ কী?

৩. শেষনবি মুসাদ্দিক ছিলেন ঠিকাছে; কিন্তু মুবাশশির বলার কারণ কী?

কারণগুলো এখানে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলে কথা অন্যদিকে চলে যাবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা অন্য কোনো মলাটে করা যাবে।

প্রত্যেক নবি-রাসুল ছিলেন আল্লাহর দলের কমান্ডার। তাঁদের কমান্ড মানা উম্মতের জন্য ফরজ ছিল। এই ধারাবাহিকতায় একজন নবি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর নতুন আরেকজন নবি আসার আগ পর্যন্ত চলতে থাকত সেই নবির নবুওয়াতকাল। নতুন নবি আসার পর পূর্বের নবির উম্মত যারা বেঁচে থাকতেন, তাদের জন্য জরুরি হয়ে পড়ত নতুন নবির ওপর ইমান নিয়ে আসা। যারা ইমান নিয়ে আসত, তারাই হতো আল্লাহর দলের সৈনিক। যারা আগের রেকর্ড বাজাতো, তারা হতো বিপথগামী।

নবিজির বাবা-মা কি জান্নাতি

বিশ্বনবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাবা আবদুল্লাহ, মা আমিনা বা দাদা আবদুল মুত্তালিবের চূড়ান্ত পরিণতি সম্বন্ধে যারা সন্দিহান হয়ে পড়েন, ভেবে পান না তাঁদেরকে হেদায়াতের ওপর বলবেন নাকি গোমরাহ বলবেন, জান্নাতে পাঠাবেন নাকি জাহান্নামে, তাদের বলি—এটা মোটেও আমাদের ইমানের অনুষঙ্গ নয়। তাঁরা কী ছিলেন আর কোথায় ঠিকানা হচ্ছে, সে ব্যাপারে কিয়ামতের দিন কোনো মুসলমানকে প্রশ্ন করা হবে না। সুতরাং খামাখা এই বিষয় নিয়ে কথা বাড়াবার মানে হয় না।

আর মূল কথা হলো, তাঁরা প্রত্যেকেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবি হওয়ার অনেক আগেই মারা গেছেন। যে কারণে শেষনবির ওপর তাঁদের ইমান আনার প্রশ্ন যেমন অবান্তর, ঠিক তেমনি তাঁরা কি আগের নবির ওপর বিশ্বাসে অনড় ছিলেন, তবে কি তাঁরা মিল্লাতে ইবরাহিমির ওপর ছিলেন—এসব প্রশ্নও অবান্তর এবং অসার।

বেমারি

এই অধ্যায়ের শেষ কথাটিও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে মনে হয়। তবুও বলি। আমি আগেই জানিয়েছি, আমি লিখছি আমার মতো। হয়তো দেখা যাবে পুরো বইটি জুড়ে অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তারই ছড়াছড়ি। হয়তো দেখা যাবে মূল বিষয় থেকে আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়েই কথা বলছি বেশি। কারও কাছে ভালো লাগবে, কারও কাছে মন্দ। কিচ্ছু করার নাই।

আমি অনেক লেখককে দেখি মুহাম্মাদ বা মহানবি লিখে নামের শেষে সংক্ষেপে 'সা.' লিখে দেন। জায়েজ না-জায়েজের প্রসঙ্গ না হলেও বিবেকের প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলাই যায়। এত কিপটেমি কেন? শত শত পৃষ্ঠা টাইপ করা গেল; অথবা কাগজে লেখা গেল আর নবির নামটি আসার পর দায়সারা গোছের 'সা.' দিয়ে পার পেয়ে যাওয়া কেন? সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাক্য পুরোটা লিখলে কী হয়?

অলসতা?

আঙুল ব্যথা করে?

কাগজ বেশি লাগে?

স্পেস বেশি লেগে যায়?

বেমার আসলে কোনটি আমি জানি না। শুধু জানি এটিও একটি বেমার। চিকিৎসা দরকার।

শয়তানিক উপদল

আল্লাহর দল আর শয়তানের দল সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণাটা যদি সকলের কাছে ক্লিয়ার হয়ে থাকে, তাহলে এবারে দেখার বিষয় দল দুটির উপদলসমূহ কী কী? সেগুলোর স্বরূপ কী? প্রকৃতিই-বা কেমন?

যেহেতু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়ে দিয়ে গেছেন—

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نَبِيَّ بَعْدِي.

আমি শেষ নবি, আমার পরে আর কোনো নবির জন্মই হবে না।[২]

তাহলে যারাই মুসলমান দাবি করার ইচ্ছা করবেন, তাঁদের একমাত্র পথ হলো নবিজিকে শেষনবি হিশেবে মেনে নেওয়া। যারা নেবেন, তাঁরা মুসলমান। তাঁরা আল্লাহর দলের লোক। যারা দাবি করবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বীকার করি; কিন্তু তাঁর কথা মানবে না, তারাই হলো আহলুশ শায়তান বা শয়তানের চ্যালা-চামুণ্ডা।

যারা আল্লাহ বিশ্বাসী না অথবা একাধিক স্রষ্টায় বিশ্বাসী, তারা আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের বাইরে। এই বই আস্তিক-নাস্তিক বা তাওহিদ নিয়ে নয়। বইটি মূলত আকিদা বেইজ। যদিও তাওহিদ হচ্ছে আকিদার মূল; কিন্তু সেটি স্বতন্ত্র এবং ব্যাপক একটি ব্যাপার। তাই আমাদের আলোচনা থাকবে মুসলমান দাবিদারদের মধ্যে যারা শয়তানের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন, তাঁদের নিয়ে। অবশ্য বক্ষ্যমাণ এই গ্রন্থে ফতোয়ার ভাষায় কথা হবে না। কাউকে সরাসরি অমুসলিম বা মুরতাদও বলা হবে না। এখানে শুধু কুরআন-হাদিসকে সামনে রেখে যুক্তির আলোকে কথা হবে। অবশ্য কেউ যদি বইটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়া শেষ করে কারও ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যান, সংশ্লিষ্টকে সম্ভাব্য ক্যাটাগরিতে ফেলে একটা কিছু বিশেষণ দিয়ে দেন—দিতে পারেন, আমার কোনো আপত্তি থাকবে না।

---

[২] *তিরমিজি* : ২৩১৬।

শয়তানের কর্মনীতি

শয়তান অনেক ঝানু মাল। অত্যন্ত সুক্ষ্ম আর স্বচ্ছ তার প্লানিং। স্টেপ বাই স্টেপ আগায় সে। শুরু থেকেই শুরু করে। ইট যখন ফর্মায় থাকে, তখন যদি—ফর্মায় থাকতেই যদি বাঁকা করে ফেলা যায়, পরে আর কষ্ট করতে হলো না। আল্লাহ বলেছেন,

> শয়তানের পদাঙ্ক অনুসারী হয়ো না। [সুরা বাকারা : ২০৮]

কিছু মানুষের অনুসরণ শুরু হয় শুরু থেকেই। চলুন দেখি শয়তানের স্টেপ বাই স্টেপ কাজের ধরণটা কেমন। আত্মরক্ষার জন্য এগুলো জেনে রাখা দরকার।

প্রথম স্টেপ

একজন মানুষের জন্মের সূচনা যখন, বাবা-মা যখন কাছাকাছি যান... আচ্ছা আরও সহজ করে বলি। একজন লোক যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে বিছানায় (!) যায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দুআ পড়ো—

بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

বিসমিল্লাহ, আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইতান ওয়া জান্নিবিশ শাইতান মা রাজাকতানা।

হে আল্লাহ, তোমার নামে শুরু করছি। আমাদের থেকে শয়তানকে দূরে রাখো আর আমাদের ইনকামিং সন্তানকেও শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচিয়ে রেখো।

ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হাদিস—

قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله، قال بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فإنه أن يقدر بينهما ولد فى ذلك لن يضره شيطان أبدا.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন... তাহলে যদি তাদের কিসমতে কোনো সন্তান আসে, সে সন্তানকে শয়তান কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[৩]

আমরা সেটা ভুলে যাই। জোশের জোয়ারে কম লোকেরই হুঁশ ঠিক থাকে। বিসমিল্লাহ ছাড়াই শুরু হয় কর্মকাণ্ড। শয়তান পাশে থেকে বলে, আই'ম রেডি অলসো, লেটস্

---

[৩] *সহিহ বুখারি : ৬৩৮৮।*

ডু এনজয় টুগেদার। চল মিলেমিশে মেলামেশা করি। এখন সলিমুদ্দি আর শয়তান, দুজনের যৌথ মেহনতের ফসল লালু-কালু-বিউটি বড় হয়ে আর লাইনে আসবে কেমন করে? গোড়াতেই যেখানে গলদ, শয়তানের অংশীদারত্ব।

পরের ধাপ

জন্মের সময় যখন সুযোগ নিতে পারল না, তখন শয়তানের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হয় আলতু-ফালতু একটা নাম যেন রাখানো যায়। সে জানে নামের একটা আসর আছে। কিয়ামতের দিন একপর্যায়ে ভালো নামের কারণেও আল্লাহপাক অনেক বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেওয়ার একটা ব্যাপার তো আছেই, দুনিয়াতেও নামের সঙ্গে ব্যক্তির চারিত্রিক একটা যোগসাজশ থাকে। মজনু অর্থ পাগল। আমি আমার জীবনে মজনু নামের যতগুলো মানুষ দেখেছি, তারা কিছু না কিছু কোনো না কোনো পর্যায়ের...

পরের ধাপ

বাচ্চাটি বড় হয়ে গেল। মা-বাবা ভালো নামই রাখলেন। স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। নামাজ ফরজ হয়েছে। ছেলেটি নামাজে যেতে চায়। মেয়েটি নামাজ পড়তে চায়। শয়তান এসে বলে, 'নামাজ পরে পড়িস। তুই যে কাজ করছিস, এটার মূল্য কি তুই জানিস? তুই হলি ছাত্র। নবিজি বলেছেন, "ছাত্রদের পায়ের নিচে আল্লাহর ফেরেশতারা তাদের ডানা বিছিয়ে দেয়।"' এখানে সে সামান্য একটু কারিগরি করে। তালিবুল ইলিমের অর্থ সরাসরি ছাত্র করে দেয়। শয়তানের কাছ থেকে হাদিস শুনে লালু বলে, 'আচ্ছা ঠিকাছে।' বিউটি বলে, 'তাহলে আর সমস্যা কী!'

পরের ধাপ

পড়ালেখা শেষ, চাকরি অথবা ব্যবসা শুরু। নামাজের টাইম হয়েছে। মানুষটি নামাজে যেতে চায়। শয়তান এসে বলে, 'কেন তাড়াহুড়া করছিস? হালাল রুজি করাও তো ফরজ ইবাদত! আল্লাহ কুরআনে বলেছেন। আগে কাজ শেষ কর। নামাজ পরে পড়িস। আল্লাহ গাফুরুর রাহিম।' কালু বলে 'আচ্ছা'। বিউটি বলে, 'ঠিকাছে'।

পরের ধাপ

শয়তানের নসিহত না মেনে লোকটি জুহরের সময় মসজিদে এসে গেছে। সে-ও হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র না। কাছে এসে বলবে, 'জুহর-আসর একসঙ্গেই পড়েনে। এই দুই নামাজ একসঙ্গে পড়া যায়। রাসুলও পড়েছেন, সহিহ হাদিস!'

পরের ধাপ

জুহর, আসর, এশা ঘরেই পড়ে ফেল। ফজর আর মাগরিবে মসজিদে যাস। দিনের প্রথম আর রাতের প্রথম নামাজ জামাআতে পড়ে নিলি। দিন-রাতের শুরুটা সঠিকভাবে হয়ে গেল। তোর নিয়ত তো আল্লাহ দেখছেন। *ইন্নামাল আমালু বিন-নিয়্যাত*। হাদিস সহিহ।

পরের ধাপ

এক কাজ কর। মাগরিবটা দোকানেই পড়। এটা দোকানদারির সময়। এশা আর ফজর জামাআতে আদায় করবি। এশার নামাজ জামাআতের সঙ্গে পড়ে ঘুমালে আর ফজরের জামাআতে শরিক হলে সারারাত ইবাদতেই গণ্য হয়, সহিস হাদিস। আর এশাটা যেহেতু জামাআতের সঙ্গেই আদায় করেছিস, এখন ঘণ্টাদুয়েক মৌজ-মস্তি কর। গান-টান শোন। এশা-ফজরের মধ্যখানের টাইম তো ইবাদতেই গণ্য হচ্ছে—সমস্যা নেই। সারাদিন কাজ করেছিস, ব্রেইনের একটু রিলাক্সের দরকার আছে না?

পরের ধাপ

গত জুমআ তো পড়েছিস। সামনের শুক্রবারে গিয়ে আবার জুমআ পড়ে নিস। বাকি নামাজ এই বয়সে আর নাইবা পড়লি। সমস্যা হবে না। রাসুল বলছেন, দুই জুমআর মধ্যবর্তী সব গোনাহ মাফ, হাদিস সহিহ। চিন্তার কোনো কারণ নেই!

তারপরের ধাপ

এত নামাজ-টামাজ বাদদে তো! রমজান মাসটা একটু কষ্ট করে রোজা রেখে নিস। একটা মাস একটু কষ্ট করবি বাকি ১১ মাস করবি ফুর্তি। যাকে বলে ওয়ান-ইলেভেন ফর্মুলা। রাসুল বলেছেন, যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখবে, তার পূর্বেকার সব গোনাহ মাফ, সহিহ হাদিস। খামাখা সারাবছর কষ্ট করবি কোন দুক্কে?

এবং তারপরের ধাপ

দেখ, এখনো ইয়াং তুই। একটু বয়স হোক। এই ধর ফিফটি প্লাস। তারপর হজে চলে যাবি। হাজরে আসওয়াদে লম্বা করে একটা চুমু দিবি, জিন্দেগির সব গোনাহ মাফ। হজ করলে জীবনের সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়, ঠিক মায়ের পেট থেকে যেভাবে নিষ্পাপ জন্ম নিয়েছিলি, তেমন হয়ে যাবি। সহিহ হাদিস।

এতগুলো সহিহ হাদিসের যাঁতায় পড়ে কালু আর বিউটির বিবেক ভোঁতা হয়ে যায়।

এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে কাজ করে। কথায় কথায় সহিহ হাদিস বলে ধোঁকা দেয়। তার হাতে থাকে অনেকগুলো অপশন। একটা কাজ না করলে অন্যটা, তারপর অন্যটা। আত্মরক্ষা করা অনেক মুশকিল। উপরন্তু এখন যেভাবে শয়তানির সঙ্গে খান্নাসিও শুরু হয়েছে, শয়তান আর উপ-শয়তান মিলে যেভাবে যৌথবাহিনী গঠন করে কাজ শুরু করেছে, তাতে চোখ-কান একটু বেশিই খোলা রেখে, একটু বেশিই সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। তা না-হলে আম তো যাবেই, ছালাও যাবে।

আল্লাহ মানি, কেমন মানা

দাবি করলাম আমি আল্লাহ মানি; কিন্তু আল্লাহর সবকথা মানলাম না, এটা কেমন মানা হলো? বলা হবে, আমরা তো এমন আজগুবি কথা কাউকেই বলতে শুনলাম না! আমি শুনেছি। অহরহই শুনছি। আমি জানি আপনারাও শুনছেন; কিন্তু ব্যাপারটি আলাদা করে আলাদা করতে পারছেন না। ব্যাখ্যা করছি। তারপর দেখুন এমন জিনিসদের সঙ্গে উঠতে-বসতে আপনাদেরও মোলাকাত হয় কি না!

আচ্ছা আগে একটা গল্প শুনুন। গল্পটি আমি কিছুদিন আগে নব্য-পণ্ডিত আমার এক বন্ধুর সঙ্গে করছিলাম। অতি-সম্প্রতি সে লা-মাজহাবিত্বে দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তারপর থেকে সে কথায় কথায় হাদিসের ঢেকুর দিচ্ছে! আচ্ছা গল্পটি আপনাদের শোনাই।

ছেলেটি বাবা-মাকে খুবই সম্মান করে। সবাইকে বলে, 'আমি আমার মা-বাবাকে খুব মান্য করি। বাবা যতদিন ছিলেন, বাবার কথা মানতাম। বাবা নেই, মা আছেন। আমি মায়ের কথার বাইরে চিন্তাও করি না।' কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেল ভেতরবাড়ির কাহিনি হচ্ছে—

মা বলছেন, 'ও বাবা! আমার জন্য বাজার থেইকা চাইরডা কামরাঙ্গা আনিস তো বাজান। ক-দিন ধরে মুখে রুচি পাইতেছি না।' সে বলছে, 'যত বয়স হইতেছে, আক্কেল-জ্ঞান তো দেখি তোমার ততই কমতাছে মা। এই বয়সে কেউ কামরাঙ্গা খায়?'

—আচ্ছা তাইলে থাউক, কামরাঙ্গা লাগব না।। দুই পিস আমিত্তি আনিস। মুখডা খালি তিত্তা লাগে!

—এই দেখো! অষুধ ঢালতে ঢালতে ডায়বেটিস কমান যাইতেছে না; আর উনি আবার মিষ্টি খাইতে চায়! কী যে মা কমু তোমারে!

—আচ্ছাগো বাবা, কিচ্ছু আননের কাম নাই। তোর বউরে কইয়া যা আমারে জানি ইট্টু জাউ-খিচুড়ি রাইন্ধা দেয়।

—আহ-হা মা! তোমার নাতনীরে ইস্কুলে লইয়া যাওন, আবার যাইয়া আনন, ঘর-দুয়ার ঝাড় দেওয়া, হাড়ি-পাতিল মাজন, রান্ধাবাড়া তো আছেই। তুমিই কও, তারে আমি কোন বিবেকে কই তোমারে আলাদা কইরা জাউ রাইন্ধা দিতে? কও মা, এইডা কি ঠিক অইব?'

মা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চোখ মুছেন আর বলেন, 'না বাজান, ঠিক অইব না। আমি এত্ত খিয়াল করি নাই। হুট কইরা কইয়া দিছি। বয়স হইছে তো, কী কইতে কী কইয়া ফালাই বুঝি না। বাদদে বাজান। তোর দেরি হইতাছে। তুই কামে যা।'

—আচ্ছা মা, আমি তাইলে যাই। অষুধ মনে কইরা খাইয়ো কইলাম।

ছেলে বাইরে চলে গেল। মা ছেলের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল ৩০ বছর আগের কিছু স্মৃতি। ছেলের বয়স তখন দশ কি এগারো। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে তখন আষাঢ় মাস ছিল। ছেলের জ্বর হয়েছে। একশ এক কি দুই হবে জ্বরের মাত্রা। কিছুই খেতে চাচ্ছিল না। তিনি কতভাবে চেষ্টা করছিলেন ছেলেটিকে খাওয়াতে, সে কিছুই খায় না। নরম করে খিচুড়ি বানিয়ে দিচ্ছেন, বার্লি বানিয়ে দিচ্ছেন—সে মুখেই দেয় না! জোর করে এক চামিচ খিচুড়ি মুখে তুলে দিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে 'ওয়াক' করে বমি করে দিলো! তিনি বার বার বলেন,

—ও বাজান! ক, তোর কী খাইতে মন চায় আমারে ক?

—আমি কিচ্ছু খামু না।

—কিচ্ছু না খাইলে তো হইব না বাজান। ডাক্তার কইছে কিছু খাইয়া অষুধ খাইতে। ল, এক চামুচ বার্লি খাইয়া ল...

চামিচ এগিয়ে নিতেই ছেলে থাবা দিয়ে চামিচ ফেলে দিয়েছে। তিনি নীরবে উঠিয়ে নিয়েছেন। রাগ না করে হাসিমুখে বলেছেন, 'আচ্ছা ঠিকাছে, বার্লি খাওনের কাম নাই, শরবত কইরা দিই? লেবুর শরবত?'

—আমি বেলের শরবত খামু।

ঘরে লেবু ছিল তাই লেবুর শরবত করে দিতে চাইছিলেন। ছেলে চাইল বেলের শরবত। রাত তখন সাড়ে নয়টা। গ্রাম-গঞ্জে এটা প্রায় মধ্যরাত। এই রাতে এখন তিনি বেল পাবেন কই? 'বাজারে কি কোনো দোকান খোলা আছে, গেলে কি বেল পাওয়া যাবে'—কোনো কিছু না ভেবেই চিপচিপে বৃষ্টির পিচ্ছিল মেটো পথ মাড়িয়ে দেড় মাইল দূরের বাজারে চলে গিয়েছিলেন তিনি। বেল কিনে এনে ছেলেকে বেলের শরবত বানিয়ে খাইয়েছিলেন—সেই ছেলে এখন বড় হয়েছে। সেই ছেলেই আজ...

তিনি আর ভাবতে পারলেন না। চোখে এমনিতেই ছানি পড়ে গেছে। বেশি পানি বেরোলে সমস্যা আরও বেড়ে যাবে।

এই হলো গল্প। এই ছিল মা-ভক্ত ছেলের গল্প। আমি আমার বন্ধুকে বললাম, আচ্ছা বলতো, গল্পের ছেলেটি তার মাকে কতখানি ভালোবাসতো?

সে বলল, গাধাটাকে ধরে থাপড়ানো দরকার।

—মাকে সে মান্য করত কত পার্সেন্ট?

—ছাগলটাকে ধরে কয়েকটা লাথি দেওয়া উচিত।

বুঝতেই পারছেন উপরের গল্পটি তাকে প্রভাবিত করে ফেলেছিল। আমি গুছিয়ে গল্প বলতে পারি না—এটি সম্ভবত পেরেছিলাম। যে কারণে তার ইচ্ছা করছিল ছেলেটিকে কাছে পেতে এবং লাথি-থাপ্পড় লাগাতে। সেটা সম্ভব হচ্ছিল না দেখে প্রশ্নের জবাবে লাথি-থাপ্পড় দিয়ে হালকা হতে চেষ্টা করছিল সে।

আমি তাকে বললাম, চল তোকে একটু হালকা করে দিই। উপরের গল্পটি সম্পূর্ণ বানানো। এটি কোনো সত্যি ঘটনা না। তোর রাগ করার কোনো দরকার নাই। তুই রেগেছিলি বলেই তোর লজিক এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল; আর আমার প্রশ্নের উত্তরে চড়-থাপ্পড়ের কথা বলছিলি।

সে স্বাভাবিক হয়ে এলো। আমি বললাম,

—আচ্ছা কিছু সময়ের জন্য ধরে নে উপরের ঘটনাটি সত্য। তাহলে ওই ছেলেকে তুই কত পারসেন্ট মা-ভক্ত বলবি?

—আমি তাকে মা ভক্ত বলব না।

—তার তো দাবি, সে তার মাকে মান্য করে।

—সে মিথ্যা দাবি করে।

—মিথ্যা বলছিস কেন? সে তার মায়ের কিছু না কিছু কথা তো মানেই।

—কিছু না কিছু মানাকে 'মা মানা' বলে না। মায়ের কিছু কথা মানলে আর কিছু না মানলে এটাকে মাতৃভক্তি বলা যায় না।

—তাহলে তাকে তুই কী বলবি?

—আমি তাকে মায়ের কুসন্তান বলব।

—ঠিক। তাই বলা উচিত। তোর মূল্যায়ন যথার্থ হয়েছে। এখন চুপিচুপি জানিয়ে দিই,

একটু আগে যে বলেছিলাম গল্পটি সত্য না, কথাটি মিথ্যা বলেছিলাম। এটি কিন্তু আসলে সত্যি গল্প। তোর ইচ্ছা করলে তুই আবার মন খারাপ করতে পারিস। মনে মনে তাকে কিল-ঘুষি মারতে চাইলেও মারতে পারিস। আমার কোনো আপত্তি নেই!

সে আমার মুখের দিকে তাকালো। বলল,

—তাহলে মিথ্যা বললি কেন?

—কী মিথ্যা বললাম?

—ওই যে বললি, এটি আসলে সত্যি ঘটনা না।

—দেখ, এই মিথ্যার জন্য আমার কোনো পাপ হবে না। কারণ, আমি সত্যি বলেছিলাম।

সে পুরাই প্যাঁচ খেয়ে গেল। আমি জানি এই প্যাঁচ আমি খুলে না দিলে সে জীবনেও খুলতে পারবে না। আমি বললাম, চল প্যাঁচ খুলে দিচ্ছি। এটি কারও কোনো সুনির্দিষ্ট ঘটনা না। আমি দেখিওনি, কেউ আমাকে বলেওনি। ঘটনাটি আমি বানিয়ে বানিয়ে বলেছি। এই অর্থে এটি অবশ্যই একটি মিথ্যা গল্প। আমিও তোকে বলেছি এটি মিথ্যা গল্প।

আবার এমন ঘটনা সারা বিশ্বে হাজার হাজার ঘটছে, তাই এটি একটি চরম সত্য ঘটনা। সুতরাং আমিও বললাম এটি একটি সত্য ঘটনা। কিছু বুঝলি?

সে কিছু বুঝল কি না আমি বুঝতে পারলাম না। কারণ, সে তখন উলটো দিকে হাঁটা ধরেছে। চেহারার কন্ডিশন দেখলে আন্দাজ করতে পারতাম সে বুঝতে পারছে কি না! শুধু লক্ষ করলাম, দুই হাত দিয়ে কানের উপরের অংশে মাথার চুলগুলো আলতো করে টানছে!

গল্প এবং গাল্পিক কথাবার্তা শেষ।

যারা বলেন আল্লাহ মানি; কিন্তু আল্লাহর কথা মানি না, তাঁরা কি আসলেই আল্লাহ মানেন? 'আল্লাহ মানা' মানে কী? প্রশ্ন ছিল, কাউকে তো শোনা যায় না বলতে, আমি আল্লাহ মানি; কিন্তু আল্লাহর কথা মানি না।

আমি যদি আপনাকেই প্রশ্ন করি, গল্পের ছেলেটি কি তার মাকে আসলেই মান্য করত? অর্থাৎ, মায়ের আদেশ মানতো?

আপনি বলবেন, না।

যদি বলি, সে তো কখনো বলেনি 'মাকে মানি না', তাহলে?

আপনি বলবেন, বলতে হবে কেন? সে তো তার কাজ দিয়েই প্রমাণ করল মাকে মোটেও পাত্তা দিচ্ছে না।

তাহলে যারা দাবি করেন, 'আমরা আল্লাহ মানি', তাদের অনেকেই যে তাদের কাজ দিয়ে প্রমাণ করছেন 'আমরা আল্লাহর সবকথা মানি না'—এটা কি আরও ব্যাখ্যা করে বোঝানোর দরকার আছে?

আল্লাহ বলেন,

﴿اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ﴾

আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর-রাসুলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম।

আমাকে মানো, আমার রাসুলকে মানো আর মানো উলামা-ফুকাহাকে।
[সুরা নিসা : ৫৯]

এখন যারা বলবেন, আমরা শুধু আল্লাহ এবং রাসুলকে মানি, কুরআন এবং হাদিস মানি, আর কাউকে মানি না; তারা কি সুরা নিসায় নির্দেশিত আল্লাহর উপরিউক্ত কথাটি মানলেন? আল্লাহ এবং রাসুল মানাই যদি যথেষ্ট হতো, আল্লাহ তবে *আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর-রাসুল* অর্থাৎ, আল্লাহকে মানো আর রাসুলকে মানো' বলেই কথা শেষ করে নিলেন না কেন? 'উলুল আমর' বলার দরকার কী ছিল?

আহলে সুন্নাত আহলে হাদিস

আহলে সুন্নাত মানে সুন্নাতওয়ালা, আহলে হাদিস মানে হাদিসওয়ালা। সুন্নাতওয়ালারা কোনো একটি সুন্নাত আঁকড়ে ধরলে ১০০ শহিদের সওয়াব পায়। আবু হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত হাদিস—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتى عند فساد أمتى فله أجر مأة شهيد.

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ফিতনার যুগে যে কেউ আমার একটি সুন্নাত আঁকড়ে ধরবে, সে ১০০ শহিদের সওয়াব পাবে।'[৪] অন্যদিকে হাদিসওয়ালাদের সামনে এমনও হাদিস আছে, যেগুলোয় আমল করলে ইমানই থাকবে না। এ জন্যই মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসংখ্য হাদিসে বলেছেন, 'আমার সুন্নাতের অনুসরণ করো' কিন্তু ১০ লক্ষাধিক হাদিসের মধ্যে একটি হাদিসও কেউ দেখাতে পারবে না, যেখানে বলা আছে 'আমার হাদিসের অনুসরণ করো।'

'আহলে সুন্নাত' নাম রেখেছেন রাহমাতুল্লিল আলামিন; আর সার্টিফাই করেছেন স্বয়ং রাব্বুল আলামিন। অন্যদিকে 'আহলে হাদিস' নাম নিয়েছেন কিছু মানুষ; আর তাদের ধারণ করা এই নাম তাঁরা সার্টিফাই করিয়ে নিয়েছেন ইংরেজদের দ্বারা। এখন মুসলমান ইংরেজ সার্টিফাইড আহলে হাদিসের ফাঁদে পা দেবে, নাকি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদায় আমল করবে—সিদ্ধান্ত নেওয়া কি খুব কঠিন?

সুন্নাত ও হাদিসকে অনেকেই গুলিয়ে ফেলেন। সমস্যাটা তৈরি হয় তখনই। আলিমগণ সুন্নাত ও হাদিসে ব্যবধানের দাস্তান হাজির করতে পারবেন। আমি দু-একটি উল্লেখ করি।

১. হাদিস কখনো সহিহ হয়, কখনো দুর্বল; কিন্তু সুন্নাত কখনো দুর্বল হয় না। সুন্নাত সবসময় সর্বাবস্থায় শক্তিশালী এবং আমলযোগ্য।

২. হাদিস কখনো নাসিখ হয় কখনো মানসুখ; কিন্তু সুন্নাত কখনো মানসুখ হয় না।[৫]

৩. সকল হাদিস উম্মতের জন্য অনুসরণীয় নয়; কিন্তু সকল সুন্নাত অনুসরণীয়।

---

[৪] *মিশকাত* : ১৭৬।

[৫] মানসুখ মানে রহিত, নাসিখ মানে যা দ্বারা পূর্বেকার হাদিসের কার্যকারিতা রহিত করা হয়েছে।

৪. এমন অনেক সহিহ হাদিসও আছে, রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে যেগুলোয় আমল করলে ইমানহারা হতে হবে; কিন্তু সুন্নাত সর্বাবস্থায় পুণ্যময়।

৫. অনেক ব্যাপারে (সময় ও অবস্থার কারণে) দু-ধরণের হাদিস আছে; কিন্তু সুন্নাতের বেলায় এমন কিছু নেই, হয় না।

যারা আহলে হাদিস বলে দাবি করেন ব্যাপারগুলো তারাও যে বুঝেন না এমন না কিন্তু। তারাও যখন বিয়ের কার্ড ছাপেন, সেখানে... *আগামী এত তারিখ রোজ অমুক বার তমুক সেন্টারে নবিজির 'হাদিস' হিশেবে আমার পঞ্চম কন্যার শুভ বিবাহের বা ওয়ালিমা অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করা হইয়াছে। আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত* এভাবে লিখেন না। লিখেন, নবিজির 'সুন্নাত' হিশেবে। ওয়ালিমা করেন; কিন্তু 'হাদিস' ওয়ালিমা বলেন না, সুন্নাত ওয়ালিমাই বলেন। নামাজে দাঁড়ান যখন কাউকে বলতে শোনা যায় না, চল, দু-রাকআত হাদিস পড়ে ফেলি! বলেন, দু-রাকআত সুন্নাত আদায় করি। এর মানে তারাও বুঝেন হাদিসের অনুসরণ বলতে কিছু নেই। অনুসরণ সুন্নাতেরই করতে লাগে। ব্যাপারটি তারা স্বীকার করতে চান না। কেন চান না সেটা বোঝার জন্য ইমাম গাজালি বা আইনস্টাইন হওয়ার দরকার হয় না। ধান্ধার বাজার মান্দা করে ফেললে তো মুশকিল!

একটু আগেই বলা হয়েছে 'আহলে সুন্নাত' নামটি স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। দলিল ছাড়া তো মানতে রাজি হবেন না। সুরা আল-ইমরানের আয়াত নাজিল হলো,

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ﴾

সে দিন কিছু চেহারা হবে উজ্জ্বল-ফর্সা। [সূরা আল-ইমরান : ১০৬]

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতটি তিলাওয়াত করে বললেন, 'এখানে যাদের চেহারার ঔজ্জ্বল্যের কথা বলা হচ্ছে তারা হলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত।'

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال: تبيض وجوه أهل الجماعة والسنة، وتسود وجوه أهل البدع والأهوء[১].

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে *তাফসিরে ইবনে কাসিরে* এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—

قوله تعالى: يوم تبيض وجوه و تسود وجوه. يعنى: يوم القيامة، حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة.

[১] *আদ-দুররুল মানসুর* : ২/১২২।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চেহারা উজ্জ্বল হবে; আর বিদআতি ফিরকার চেহারা হবে অন্ধকার।[৭]

একটি হাদিসও কেউ কোথাও দেখাতে পারবেন না, যেখানে 'হুম আহলুল হাদিস' বা এ জাতীয় কিছু বলা হয়েছে কখনো। এমনকি ইশারা-ইঙ্গিতেও। তাহলে আলো ভেবে আলেয়ার পেছনে এ কেমন ছুটে চলা?

সব হাদিসে আমল করা যাবে না কেন?

বলা হয়েছে, এমন অনেক হাদিস আছে, যেগুলোয় আমল করলে সওয়াব তো বহুত দূরের কথা, ইমান নিয়েই টানাটানি শুরু হয়ে যাবে। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি :

১. *সহিহ বুখারি*তে নবিজির দাঁড়িয়ে পেশাব করার হাদিস আছে।

عن حذيفة رضى الله عنه قال: أتى النبى صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ.

কিন্তু এটা 'হাদিস', সুন্নাত নয়। শরিয়তসম্মত কারণে বাধ্য হলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েজ বোঝানোর জন্য নবিকে দিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা করানো হয়েছিল। এখন হাদিসওয়ালারা কী করবেন? দাঁড়িয়ে পেশাব করার হাদিস পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুরু করে দেবেন?

২. *বুখারি*তে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত হাদিস। নবিজি ঘুম থেকে উঠে অজু ছাড়াই নামাজ পড়ে ফেললেন। আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন, يارسول الله ! أتنام قبل أن توتر؟ নবি জানালেন, إن عينى تنامان ولا ينام قلبى 'আমার চক্ষুযোগল ঘুমায়; কিন্তু অন্তর জেগেই থাকে।'[৮]

হাদিসওয়ালারা যদি এখন এই হাদিসের ওপর আমল করে জেনে-বুঝে অজু ছাড়াই নামাজ আরম্ভ করে দেন, তাহলে তো ইমানই থাকবে না।

এমন উদাহরণ অনেক টানা যায়। কথা না বাড়িয়ে সংক্ষেপ করে বললে কুরআন-হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদেরকে রাসুলের সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে, হাদিসের নয়। আহলে সুন্নাত হতে হবে, আহলে হাদিস নয়। আহলে সুন্নাতের অনুসারীদের জন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে রেখেছেন, আহলে হাদিসের অনুসারীদের জন্যে নয়।

---

[৭] *তাফসিরে ইবনে কাসির* : ১/৩৯০।

[৮] *সহিহ বুখারি* : ১১৪৭, ২০১৩,৩৫৬৯।

আহলে হাদিস এবং আহাফি

আসল আহলে হাদিস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত—এই কথা কেউ অস্বীকার করে না। আধ্যাত্মিক সম্রাট আবদুল কাদির জিলানি *গুনিয়াতুত-তালিবিনে* যে বলেছেন, 'আহলে হাদিসই আহলে সুন্নাত,' অন্য কিছু আলিমও যে আহলে হাদিসকে আহলে হক বলেছেন, সেখানটায় দ্বিমত করার কোনোই কারণ নেই। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উবাই ইবনে কাআব, আবু মুসা আশআরি, মাআজ ইবনে জাবাল রা.-সহ অন্য মুজতাহিদ সাহাবিগণ যদি কোথাও বলে থাকেন 'আমরা আহলে হাদিস', তাহলে অবশ্যই তাঁরা আহলে হাদিস। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ি, ইমাম আহমাদ আহলে হাদিস পরিচয়ে পরিচিত হতেই পারেন। সুফিয়ান সাওরি, আওজায়ি, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক যদি নিজেদের আহলে হাদিস বলে দাবি করেন, করতেই পারেন। কারণ, আক্ষরিক অর্থেই তাঁরা হাদিসের আহল তথা আহলে হাদিস। আগেই বলেছি, প্রকৃত আহলে হাদিস হলে তাঁদেরকে আমরা শ্রদ্ধা করি। আমরা কথা বলছি আহাফি বা আহলে হাদিস ফিরকা নিয়ে। এখন দেখবার বিষয়, প্রকৃত আহলে হাদিস কারা আর আহাফি কারা? আহলে হাদিস আর আহাফির মাঝে পার্থক্য কী?

যারা হাদিস জানেন জানার মতো, হাদিস মানেন সুন্নাতের সঙ্গে মিলিয়ে, তাঁরাই হচ্ছেন উলামায়ে আহলে হাদিস। তাঁরা আহলে হকের অন্তর্ভুক্ত। হাদিস যদি কেউ না-ই জানে, মানবে কেমন করে? দু-চার গণ্ডা হাদিস জানাকে যদি হাদিস জানা বলা হয়, তাহলে তো পৃথিবীর সবাই সবকিছু হয়ে যাবে; অথচ সবাই সবকিছু জেনে ফেললে কারও কিছুই জানা হয় না। যেভাবে সবাই ইমাম হয়ে গেলে কারোই ইমাম হওয়া হয় না। ইমাম বলা হয় যার পেছনে মুকতাদিগণ ইকতেদা করে নামাজে দাঁড়ান। সবাই যদি ইমাম হয়ে যান, তাহলে পেছনে দাঁড়ানোর জন্য কোনো মুকতাদিই থাকলেন না, তাহলে ইমাম আর ইমাম হবেন কীভাবে? ঠিক সেভাবে কিছু হাদিস জেনে যদি আহলে হাদিস হওয়া যায়, তাহলে পৃথিবীর সবাই সবকিছু হয়ে যেতে পারবে।

উদাহরণ দিই। আপনাকে দিয়েই উদাহরণ দিই। জি পাঠক, আপনার কথাই বলছি। যারা

আহলে হাদিস বলে দাবি করেন, আপনি তাদেরকে বলুন, আমি নিজে একজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, ভূগোলবিদ, গণিতজ্ঞ, আলিম, হাফিজ ইত্যাদি ইত্যাদি। সে ভাববে আপনি মজা করছেন। তাকে বলুন, আমি সিরিয়াস। সে তখন জিজ্ঞেস করবে, কীভাবে? এবার আপনি আপনার ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারগিরি ব্যাখ্যা করে তাকে বুঝিয়ে দিন। বলুন—

- দেখো, মাথাব্যথা করলে টাইলানল/প্যারাসিটামল খেলে ব্যথা সারে। বদহজমজনিত কারণে পাতলা পায়খানা শুরু হলে ফ্লাজিল/পিডিয়ালাইট খেতে হয়। এমন আরও কিছু বেমারের ওষুধ আমি জানি। সুতরাং আমি একজন ডাক্তার।
- আমি আমার মোবাইল ফোনের সিমকার্ড-ব্যাটারি খুলে আবার জোড়া লাগাতে পারি। সুতরাং আমি ইঞ্জিনিয়ার।
- পৃথিবী-সূর্য সবকিছু ঘুরছে। অনেক মাথা ঘুরিয়ে আমি বিজ্ঞানের এই ব্যাপারটি জেনেছি, তাই আমি একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীও।
- আমি ভূগোলবিদ। কারণ, আমি জানি বাংলাদেশের তিনদিকে ভারত আর একদিকে বঙ্গোপসাগর।
- ৯ আর ৬ যোগ করলে ১৫ হয়; আর গুন করলে হয় ৫৪। আমি নয়-ছয়ের অংক জানি। অতএব আমি একজন গণিতবিদ।
- আমি জানি অজুর ফরজ চারটি, গোসল করতে পানি লাগে। বুঝতেই পারছ দীনের মাসআলা-মাসায়িলও আমি কম জানি না। সুতরাং আমি একজন আলিমও।
- আর হাফিজ কীভাবে হলাম সেটা নিয়ে সন্দেহ করা মোটেও ঠিক হবে না কারণ, সুরা নাস থেকে আলামতারা পর্যন্ত মুখস্থ আছে আমার, সঙ্গে সুরা ফাতিহাও।

আপনি যখন এভাবে বলতে থাকবেন, সে হাসবে। বলবে, কয়েকটি সুরা মুখস্থ করে তুমি হাফিজ দাবি করছ কেন? এবার তাকে বলুন, যে কারণে কয়েকটি হাদিস মুখস্থ করে নিজেকে তুমি আহলে হাদিস দাবি করছ।

সে বলবে, অজুর ফরজ আর তাইয়াম্মুমের নিয়ত জানলেই তো আলিম হয়ে যাওয়া যায় না। আপনি বলুন, তাহলে কিছু হাদিস জেনেই তুমি আহলে হাদিস হয়ে গেলে কেমন করে?

সে বলবে, কয়েকটি ট্যাবলেটের নাম জানলেই কি ডাক্তার হওয়া যায়? তাকে বলুন, কয়েকজন সাহাবির নাম জেনেও তুমি কীভাবে আহলে হাদিস হতে পারলে?

এভাবে একটা একটা করে সামনে এনে তাকে সাইজ করেন। যদি দেখেন তা-ও বুঝতে

চাইছে না; অথবা তার মাথায় ঘিলুর পরিমাণ আপনার অনুমানের চেয়েও কম, তাহলে আরও সহজ উদাহরণ দিন। বড় আলিম না হলে তাকে *বুখারি-মুসলিম* বলে লাভ নেই। তাকে তার মতো সাইজে আনুন। বলুন—

আচ্ছা তুমি কি আসল আহলে হাদিস, নাকি দুই নম্বরি?

সে বলবে, অবশ্যই আসল আহলে হাদিস।

—আচ্ছা তাহলে বলো, ইলমে হাদিসের উসুল কী?

সে প্রথমেই বলবে, উসুল মানে কী?

'বাবা তুমি উসুল মানেই জানো না; অথচ দাবি করছ আহলে হাদিস'—এখনই এই কথা বলে তাকে ভাগিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। তাকে বলুন, উসুল মানে মূলনীতি। এবার বলো হাদিসশাস্ত্রের মূলনীতি কী?

—আমি জানি না।

—আচ্ছা বলো হাদিস মোট কত প্রকার?

সে বলবে, আমি জানি না।

—সমস্যা নেই। সবকথা সবাই জানেও না। হাদিস যারা শেখান, তাদেরকে মুহাদ্দিস বলা হয়। এটা জানো তো?

—হ্যাঁ, এটা কেন জানব না?

—গুড, মুহাদ্দিসিনের তবকা কয়টি?

—তবকা কী?

—তবকা মানে স্তর। তাদের স্তর কয়টি?

—আমি জানি না।

এখন তাকে বলুন, তুমি তো হাদিস শাস্ত্রের কিছুই জানো না। তাহলে নিজেকে তুমি আহলে হাদিস বলছ কোন দুক্কে? তুমি তো দেখি মোটেও আসল আহলে হাদিস না। পুরাই দুই নম্বরি। আচ্ছা বাদ দাও। আমাকে শুধু বলো, তোমাদের দলের, মানে আহলে হাদিসের জন্ম তারিখটা কবে? সঙ্গে জন্মের ইতিহাসটাও বলবে।

সে বলতে পারবে না। (জানলেও বলবে না; আর না জানলে বলবেই-বা কেমন করে। কেন বলবে না, সেটা একটু পরে আমরা যখন তাদের জন্ম-কুকীর্তির পাতা উলটাব তখন পরিষ্কার হয়ে যাবে।)

এবারে তাকে তার আরও কাছের উদাহরণ দিন। বলুন, আচ্ছা দুনিয়ায় কি মেয়ের আকাল পড়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত তোমাকে একজন ধুপী মেয়েকেই বিয়ে করতে হলো!

—ধুপী মানে কী?

—ধুপী মানে যে কাপড় ধুয়ে দেয়।

সে নাক-মুখ খিঁচে আপনাকে বলবে, কে বলেছে আপনাকে এ কথা?

—কেউ বলেনি। আমি জানি।

—মিথ্যা কথা। আমার স্ত্রী মোটেও ধুপী না। সে তালুকদার বংশের মাইয়া।

—তোমার স্ত্রী কি মাঝে-মধ্যেও তোমার জামা-কাপড় ধুয়ে দেয় না?

—তা দেয়।

—তাহলে সে ধুপী হলো না?

তখন মেজাজ খারাপ করে বলবে, আরে বাবা! মাঝেমধ্যে কাপড় ধুয়ে দিলে তাকে ধুপী বলে না। ধুপী তাকে বলা হয়, কাপড় ধোয়া যার পেশা।

তাকে বলুন, মাঝেমধ্যে হাদিস জানলে আহলে হাদিস হওয়া যায় নারে পাগলা। হাদিস যাদের পেশা, যাদের দিন কাটে হাদিস নিয়ে, রাত পোহায় হাদিসে, যারা হাদিস পড়েন, হাদিস পড়ান, হাদিসের মর্ম বোঝেন, বোঝান; তারা হলেন আহলে হাদিস।

এরপরেও যদি, এত সহজ করে বোঝানোর পরেও যদি না বোঝে, তাহলে আপনি দূরে সরে আসুন আর মনে মনে বলুন, দূরে গিয়া মর।

জন্মনিমন্ত্রণ ও নামকরণ

পাক-ভারত উপমহাদেশে আহলে হাদিস ফিরকার জনকের নাম আবদুল হক বানারসী। এই লোক তার দূরভিসন্ধি চরিতার্থ করবার জন্যে কৌশলে শহিদে বালাকোট সায়্যিদ আহমদ শহিদ রাহ.-এর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই তার উলটা-পালটা কর্মকাণ্ড এবং ভ্রান্ত কথাবার্তা প্রকাশ পেতে শুরু করলে সায়্যিদ আহমদ শহিদ তাকে সতর্ক করে দিলেন। তারপরও সংশোধন না হলে আমিরে তরিকত শাহ আহমদ শহিদ তাকে তাড়িয়ে দিলেন। দুষ্টু গরু থেকে শূন্য গোয়াল ভালো।

হজরতের ইনতেকালের পর আবার মাথাছাড়া দিয়ে উঠল সে। নিজেকে সে আহমদ শহিদের প্রধান খলিফা দাবি করে নিজেদেরকে 'মুহাম্মাদি' বলে প্রচার করতে আরম্ভ করল। সায়্যিদ সাহেবের খলিফা ও মুরিদগণ তার ব্যাপারে হারামাইন শরিফাইনের আলিমগণের

কাছে ফতোয়া তলব করলেন। সেখানকার মুফতিগণ সব জেনে আবদুল হক বানারসীকে গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট আখ্যায়িত করেন। আহাফি ফিতনার শুরুটা ছিল এভাবেই।

উনিশ শতকের শেষ জয়ন্তী। দখলবাজ ব্রিটিশ সরকার দেখল উপমহাদেশের জনগণ তাদের বিরুদ্ধে ক্রমেই বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। আর মানুষকে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার মূল কাজটা করছেন স্বাধীনতাকামী (তাদের ভাষায় রাষ্ট্রদ্রোহী) আলিম-উলামা। আরও স্পেসিফিকলি বললে উলামায়ে দেওবন্দ। এটা তো হতে দেওয়া যায় না। আলিমদেরকে বদনাম করে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে, তা নাহলে কাজ হবে না। পরিকল্পনার অংশ হিশেবে আলিমগণকে তারা 'ওয়াহাবি' বলে প্রচার করতে লাগল। ওয়াহাবিয়্যত এবং রাষ্ট্রদ্রোহের অপবাদ দিয়ে চলল গণগ্রেফতার আর নির্যাতন।

ইসলামের নামে বিচ্ছিন্নতাবাদী মুহাম্মাদি বা তাওহিদবাদী বলে দাবিদার আহাফিদের ধোঁকাবাজিটা শুরু হলো সাধারণ মানুষের সঙ্গে বেইমানির মধ্যদিয়ে। উপমহাদেশের মানুষ যখন ব্রিটিশদের গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্তির জন্য লড়ছে, তখন এই রাজাকারগুলো স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নিল ইংরেজদের গোলামি। তাদের নেতা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবি ব্রিটিশ সরকারের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে তেল চিটচিটে একখানা দরখাস্ত লিখল সরকারকে। সে লিখল, 'আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে নই। আমরা তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং আমাদের ওয়াহাবি বলো না।'

মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবি লাহুরি সম্পাদিত তৎকালীন *এশায়াতুস সুন্নাহ* পত্রিকায় প্রকাশিত দরখাস্ত ছিল এভাবে—

> *বখেদমতে জনাব গভর্নমেন্ট সেক্রেটারি,*
>
> *আমি আপনার খেদমতে লাইন কয়েক লেখার অনুমতি এবং এর জন্য ক্ষমাও প্রার্থনা করছি। আমার সম্পাদিত 'মাসিক এশায়াতুস সুন্নাহ' পত্রিকায় ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেছিলাম যে, ওয়াহাবি শব্দটি ইংরেজ সরকারের নিমকহারাম ও রাষ্ট্রদ্রোহীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এ শব্দটি হিন্দুস্তানের মুসলমানদের ওই অংশের জন্য ব্যবহার সমীচীন হবে না, যাদেরকে 'আহলে হাদিস' বলা হয় এবং সর্বদা ইংরেজ সরকারের নিমকহালালি, আনুগত্য ও কল্যাণই প্রত্যাশা করে, যা বার বার প্রমাণও হয়েছে এবং সরকারি চিঠিপত্রে এর স্বীকৃতিও রয়েছে।*
>
> *অতএব, এ দলের প্রতি ওয়াহাবি শব্দ ব্যবহারের জোর প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেন্ট বরাবর অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সঙ্গে আবেদন করা যাচ্ছে যে, সরকারিভাবে এ ওয়াহাবি শব্দ রহিত করে*

আমাদের ওপর এর ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক এবং এ শব্দের পরিবর্তে 'আহলে হাদিস' সম্বোধন করা হোক।

আপনার একান্ত অনুগত খাদিম

আবু সাইদ মুহাম্মাদ হুসাইন

সম্পাদক, এশায়াতুস সুন্নাহ।

এই আবেদনের প্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার তাদের জন্য 'আহলে হাদিস' নাম বরাদ্দ করল। পাঞ্জাব গভর্মেন্ট সেক্রেটারি মিস্টার ডব্লিউ.এম.এন বাহাদুর (চিঠি নং-১৭৫৮ এর মাধ্যমে) ৩ ডিসেম্বর ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে অনুমোদনপত্র প্রেরণ করলেন।[৯]

আহাফিরা ইংরেজদের কাছ থেকে 'আহলে হাদিস' নাম নিয়ে নামের আকিকা ছাড়াই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ইংরেজদের নিমকহালালিতে। শুরু হয়েছিল খেদমত। কী পরিমাণ পদলেহনে মত্ত হয়েছিল তারা, দুইটা মাত্র উদাহরণ দেই।

এক.

আহাফি নেতা, (তাদের ভাষায় শায়খুল কুল্লে ফিল কুল) মিয়া নজির হুসাইন দেহলবির সামনে এক ইংরেজ ম্যাম পড়লেন। মিয়া সাহেব ম্যামকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। চারমাস নিজের ঘরে রেখে ম্যামের খেদমত (!) করলেন তিনি। কেমন খেদমত সেটা অবশ্য আমরা বলতে পারব না কারণ, লেখক সেটা পরিষ্কার করে বলেননি। মিয়া নজির হুসাইনের হালতের ওপর লেখা বই *আল হায়াত বাদাল মমাত* গ্রন্থে লেখক খেদমতের ব্যাপারে এরচেয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি।

চারমাস খেদমত করার পর ম্যামকে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, স্যার! আমি ম্যামকে আমার ঘরে নিয়ে গেলাম। কারণ, রাষ্ট্রদ্রোহীরা তাকে পেলে বেইজ্জত করে মেরে ফেলত। ইংরেজ গভর্নর স্ত্রীকে ফিরে পেয়ে খুশি হলেন নাকি সন্দেহের চোখে তাকালেন, সেটাও আমাদের জানা নেই। গভর্নর মিয়া সাহেবকে বকশিশ হিশেবে কিছু জায়গা-জমি বরাদ্ধ করলেন। দিতে তো আর সমস্যা নেই। হাওরের গুরু আর মামা-শ্বশুরের ধান/ যত পারো খাও আর করে যাও দান!

দুই.

নবাব সিদ্দিক হাসান। আহাফিদের আরেক গুরু। ইংরেজ গভর্নরকে কিছুতেই সন্তুষ্ট করতে পারছিলেন না; অথচ কাজ বাগাতে হলে গভর্নরের রেজামন্দি দরকার।

---

[৯] মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবি লাহোরি সম্পাদিত *এশায়াতুস সুন্নাহ* : ৩২-৩৯, সংখ্যা : ২, খণ্ড : ১১।

কী করা যায়!

কী করা যায়!

অবশেষে উপায় খুঁজে বের করলেন তিনি। স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন লবিং করার জন্য। নবাবের স্ত্রী গভর্নরের কুটিতে একমাস কাটিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করে ফিরলেন। আর অতীব বরকতময় এই ঘটনাটি আমরা জানলাম নবাব সিদ্দিকের ছেলের লেখা থেকেই।

এই হলো আহাফি। এই হলো তাদের জন্মকথা। উপমহাদেশ থেকে শুরু হলেও এখন তারা ছড়িয়ে পড়ছে ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বব্যাপী। ইন্টারনেটকে বেইজ ধরে যত্রতত্র ফতোয়াবাজি করে বেড়াচ্ছে তারা। এখনই সময় তাদের রুখে দাঁড়াবার। এখনই যদি তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া না হয়, মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট না করে থামবে না। সূত্রও সেই আগেরটাই—

﴿وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

আমি তাদের সবাইকে পৃথিবীতে পথভ্রষ্ট করব। [সুরা হিজর : ৩৯]

দোষে-গুণে সাহাবি

'সাহাবিগণ তো আর নবি না, তাহলে তাদেরকে আবার চোখ-কান বন্ধ করে অনুসরণের কী আছে?'

এই পণ্ডিতদের কে বোঝাবে সুন্নাত মানে পরিপূর্ণ দীন। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, তথা দীনের যাবতীয় বিধানাবলি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকে এনেছেন, সাহাবিদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ থেকে যা কিছু এসেছে সব এসেছে নবির মাধ্যমে। নবি থেকে যা কিছু আমরা পেয়েছি, পেয়েছি সাহাবিগণের মাধ্যমে। আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছুতে চাইলে নবিকে ধরতে হবে। নবিকে ধরতে চাইলে সাহাবিগণকে ধরতে হবে। নবি ছাড়লে আল্লাহ মিলবে না, সাহাবিদের ছাড়লে নবি মিলবে না। এখন হয় সাহাবি মেনে নবির অনুসারী হয়ে আল্লাহর তৈরি জান্নাতে যাও। ইচ্ছা হলে সাহাবিদেরকে গালিগালাজ করে জাহান্নামে যাও। রাস্তা দুটোই খোলা আছে। যার যেখানে খুশি!

প্রশ্ন আসবে, কাউকে তো বলতে শুনলাম না 'আমরা সাহাবি মানি না।'

আসলে এ কথা কেউ সরাসরি বলে না, তবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ঠিকই বলে। কেমনে বলে বোঝার আগে কথাটি আবার মাথায় রাখি—আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়ত আমরা সাহাবিগণের মাধ্যমেই পেয়েছি। বিশ্বনবির কোনো একটি হাদিসও আমরা সরাসরি পাইনি। সবগুলোই তাঁরা বর্ণনা করেছেন। এখন তাদেরকে নিয়ে বিতর্ক করলে কুরআন আর অবিতর্কিত

থাকে না। তাঁরা যদি বিতর্কিত হয়ে যান, হাদিস আর অক্ষত থাকে না।

আমাদের সমাজে এমন অনেক মুসলমান আছেন, যাদের মূল কাজই হলো সাহাবিগণের দোষ খুঁজে খুঁজে বের করা; আর সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা। শিয়াদের কথা বাদই দিলাম। মুসলমানদের মধ্যেও কিছু লোককে দেখা যায় সাহাবিদের সমালোচনা না করলে তাদের পেটের ভাতই হজম হয় না—মুআবিয়া রা. আলি রা.-এর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে কাজটি ঠিক করেননি! আলি রা. আয়েশা রা.-এর সঙ্গে দ্বন্দ্বে না জড়ালেই ভালো করতেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরে বাবা তুমি হলে আদার বেপারি, জাহাজের এত খবর নিয়ে তোমার কাম কী? তুমি জাহাজের কী বুঝবে? তুমি কোন আলির সমালোচনা করো, যে আলি সম্বন্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِهِ مِنْ بَابِهِ.

আমি ইলমের শহর আর আলি হলো সেই শহরের দরজা। কেউ যদি ইলম চায়, দরজা দিয়ে যেন আসে।[১০]

- তুমি কোন আলি সম্পর্কে মন্তব্য করো, যে আলি হলেন আহলে বায়তের অন্যতম সদস্য, যে আহলে বায়ত সম্পর্কে নবি বিশেষভাবে সতর্ক করে গেছেন।
- কোন আলির দোষ খুঁজে বেড়াও তুমি, যে আলি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবিদের একজন, খুলাফায়ে রাশেদার অন্যতম খলিফা। তোমার কি মাথা খারাপ? তাহলে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছ না কেন?

তুমি মুআবিয়া রা. সম্পর্কে প্রশ্ন তুলো! তুমি কি জানো মুআবিয়া কে ছিলেন?

কুরআন নাজিল হওয়ার পর মুখস্থ করার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেরেশান হয়ে যেতেন। আল্লাহপাক একপর্যায়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, নবি আপনি পেরেশান হবেন না তো! আপনার বুকে কুরআন হেফাজত করে রাখার দায়িত্বও আমি আল্লাহ নিলাম। আল্লাহর ভাষায়—

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ○ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ﴾

আপনি আপনার জিহ্বা নাড়ানোর দরকার নেই, তাড়াহুড়াও করবেন না, আমি আপনার বুকে কুরআন জমা করে দেবো, পাঠ-পদ্ধতিও শিখিয়ে দেবো। [সুরা কিয়ামাহ : ১৬/১৭]

আল্লাহ কুরআন হেফাজতের কাজ কাদের দ্বারা করিয়েছেন, খবর আছে তোমার?

[১০] *মাজমাউল জাওয়াইদ* : ১৪৬৭০।

আচ্ছা মুআবিয়া প্রসঙ্গ যখন এসেই গেছে তখন কিছু কথা বলে নেওয়া যাক।

কাছের কুরআন, দূরের কিতাব

কুরআনে কারিমের শুরুতে আল্লাহর পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জিং যে বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে—

﴿ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ﴾

জালিকাল কিতাবু লা-রাইবা ফিহ। [সুরা বাকারা : ২]

এখানেও যে মিশে আছেন হজরত মুআবিয়া রা.—আমরা কি এটা জানি? আমরা কি জানি কালামুল্লাহ, কিতাবুল্লাহ আর কুরআনের মাঝে ভাবগত ব্যবধান কী?

আরবি গ্রামারমতে কাছের বস্তুর জন্য ব্যবহৃত শব্দ হলো 'হাজা' আর দূরবর্তী বস্তুর জন্য 'জালিকা'। হাজা মানে এই, জালিকা মানে ওই। কুরআন তো দূরে নয়, হাতের নাগালে। তাহলে 'হাজা' বলাটাই তো উচিত ছিল 'জালিকা' কেন?

তাফসিরকারকগণ অনেক ব্যাখ্যা করে থাকেন। অধিকাংশের ব্যাখ্যা হলো কুরআন মূলত লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই 'জালিকা' বলা হয়েছে; কিন্তু সচরাচর যে ব্যাখ্যাটি মুফাসসিরগণ করেন না সেটি হলো—

আল্লাহর কাছ থেকে ওহির মাধ্যমে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যা নাজিল হয়েছিল সেটি কিতাব ছিল না, সেটি ছিল কুরআন। নবিজি সাহাবিগণকে যা দিয়েছেন সেটিও কিতাব ছিল না, কুরআন ছিল। কিন্তু সাহাবিগণ থেকে আমরা উম্মতরা যে কুরআন পেয়েছি সেটা কুরআনও আবার কিতাবও। আমরা পেয়েছি পঠিত আকারে, লিখিত আকারেও। মনে করিয়ে দিই, কোনো কিছু লিখিত আকারে না হলে সেটা কিতাব হয় না। কিতাব হলো লিখ্য রূপ। পাঠ্য রূপকে কুরআন বলা হয়। কুরআন মানে বহুল পঠিত।

আল্লাহ জানতেন কোনো এক যুগে এসে শিয়ারা ৪০ পারার কাহিনি ফাঁদবে। জায়নাবাদের পেইড এজেন্টরা বলা আরম্ভ করে দেবে, আল্লাহ নবিকে যে কুরআন দিয়েছেন সেটা আমরা মানি। নবি সাহাবিদেরকে যে কুরআন দিয়েছেন, আমরা সেটাও মানি; কিন্তু সাহাবিগণ আমাদেরকে যে কুরআন দিয়ে গেছেন, সেখানে আমাদের কথা আছে। কী গ্যারান্টি আছে তাঁরা হুবহু লিখে দিয়ে গেছেন! কী প্রমাণ আছে তারা সংযোজন-বিয়োজন করেননি!

আল্লাহপাক আগেই জানিয়ে রাখলেন ﴿ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ﴾, যার সহজ সরল ব্যাখ্যা, 'আমি আমার নবির কাছে যে কুরআন নাজিল করেছি, তাতে কোনো সন্দেহ তো

নাই-ই, আমার নবি সাহাবিদেরকে যে কুরআন দিয়েছেন, তাতে কোনো সন্দেহ তো নাই-ই—ওই কিতাব কুরআন যখন কিতাব আকারে লিখিত হবে মুআবিয়াদের হাত দিয়ে, তাতেও সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। আমি আল্লাহ আগাম গ্যারান্টিপত্রে সাইন করে দিলাম।' আশাকরি বোঝানো গেল কুরআন হাতের কাছে থাকার পরও 'জালিকা' কেন।

কারও কারও মাথায় নিশ্চয়ই প্রশ্ন এসে গেছে যে, বিদায় হজের ভাষণে তো স্বয়ং নবিই বললেন, 'আমি তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি কিতাবুল্লাহ এবং আমার সুন্নাত।'

> تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله و سنة رسوله.
>
> আমি তোমাদের জন্য দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা এই দুটো আঁকড়ে ধরে থাকবে পথভ্রষ্ট হবে না (সেগুলো হলো) কুরআন এবং তাঁর রাসুলের সুন্নাত।[১১]

আমরা তো দেখতে পাচ্ছি, নবিও বলছেন কিতাব রেখে যাওয়ার কথা। আবার আল্লাহও তো বিভিন্ন স্থানে রাসুলকে কিতাব দেওয়ার কথা বলেছেন। তাহলে...

হাতের কাছের খুব সহজ একটা উদাহরণ দিই। আমরা বাঙালিরা হলাম মাছে-ভাতে। যত যা-ই খাই ভাত চারটা না হলে উপায় থাকে না। সেই ভাত খাওয়ার আগে আমরা কী করি? ভাত রান্না করি। বলি, চারটা ভাত রান্না করে ফেলো। আচ্ছা ভাত আবার রান্না করার কী আছে? চাল রান্না করার কথাই তো বলা দরকার ছিল।

কথাটি আমরা ওইভাবে বলি না, কারণ, চুলোয় চাল বসিয়ে দিলে ভাত যে হবেই কোনো সন্দেহ নেই; বিধায় আমরা আগেই এটার নাম দিয়ে দিই ভাত। আলিমগণকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলবেন, এখানে 'মজাজে মা-ইয়াউল' এর কায়দা ফিট হয়েছে!

নবিজি রেখে যাচ্ছেন কুরআন; কিন্তু বলছেন কিতাব। এর মানে এটা কিতাব হবে, ব্যাপারটি এতই মহাসত্য যে, যেন হয়েই গেছে। তাই আগেই নাম দিয়ে দিলেন কিতাব।

মুআবিয়া রা.

সাহাবিগণের মধ্যে পরম ভাগ্যবান ১৩ জন মুসলমান ছিলেন, যাঁদের সৌভাগ্য হয়েছিল কুরআন লেখার দায়িত্ব পালন করার। তাঁদেরকে বলা হয় 'কাতিবে ওহি' বা ওহি লেখক। এই সিরিয়ালে ছয় নম্বর নামটি হচ্ছে উম্মতের মামা[১২] মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর।[১৩]

---

[১১] *মিশকাত* : ১৮৬।

[১২] মামা কিন্তু মজা করে বলা হয়নি। রাসুলের স্ত্রীগণ উম্মতের মা। উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে হাবিবার আপন ভাই ছিলেন হজরত মুআবিয়া রা.। তাহলে মায়ের ভাই মামা হলেন না?

[১৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/১২৩।

عن ابن عباس قال: كنت العب مع الغلمان، فدعانى النبى صلى الله عليه وسلم، وقال: ادع لى معاوية، وكان يكتب الوحى.

তার মানে কুরআনের শুরুতে 'জালিকাল কিতাব'র জালিকা'র মধ্যেও মুআবিয়াকে পাওয়া যায়। সেই মুআবিয়াকে নিয়ে তুমি বকওয়াস করো! তুমি মুআবিয়ার ব্যাপারে মন্তব্য করো! তোমার সাহস কত! তুমি কি জানো মুআবিয়ার অবস্থান?

- যে মুআবিয়ার শানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

  اللّٰهُمَّ علمه الكتاب والحساب وقه العذاب.

  হে আল্লাহ, মুআবিয়াকে কুরআন এবং হিসাবে পারদর্শিতা দাও; আর তাকে আজাব থেকে দূরে রেখো।[১৪]

- যে মুআবিয়ার জন্য রাসুল দুআ করেছেন—

  اللّٰهُمَّ اجعله هاديا مهديا واهد به.

  হে আল্লাহ, মুআবিয়াকে হিদায়াতকারী বানাও, হিদায়াতপ্রাপ্তও।[১৫]

- মুআবিয়া রা. সেই মুসলমান, যাঁর যুগে মসজিদসমূহে সর্বপ্রথম মিনার তৈরি করা হয়েছিল এবং যিনি মসজিদে নববিতে সর্বপ্রথম মিম্বর তৈরি করিয়েছিলেন।

- যে মুআবিয়া লাগাতার ১৯ বছর ইসলামি খেলাফতের দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছিলেন।

- যে মুআবিয়ার হাতকে আল্লাহ 'উজ্জ্বল হাত' বলেছেন। কুরআন বলছে, بأيدى سفرة *বি-আইদি সাফারাহ*। [সুরা আবাসা : ১৫]

- যে মুআবিয়াকে আল্লাহ বলেছেন 'সারা দুনিয়ার মধ্যে মর্যাদাবান'। কুরআনের ভাষায়, كرام برررة *কিরামিম বারারাহ...*। [সুরা আবাসা : ১৬]

—বেআদবির তো একটা সীমা থাকা দরকার।

কালাম, কুরআন, কিতাব

কুরআনের তিনটি পরিভাষাও জেনে রাখি। কুরআনের নিসবত যখন আল্লাহর দিকে হয়; অর্থাৎ, কুরআন যখন আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তখন সেটা কালামুল্লাহ। কুরআন

---

[১৪] প্রাগুক্ত : ৩/১২৪।

[১৫] *সুনানে তিরমিজি* : ৪০৯৫।

যখন রাসুলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় তখন নাম হয় কুরআন। আর মুআবিয়াদের দিকে তথা কাতিবানে ওহির সঙ্গে যখন সম্পর্কিত হয়, কেবল তখনই সেটা হয় কিতাবুল্লাহ বা আল্লাহর কিতাব। সেই কিতাব, *জালিকাল কিতাব*, যেটা *লা রাইবা ফিহ*।

পরন্তু আল্লাহপাক যেখানে সকল সাহাবিগণের জন্য গণ-সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন *রাজিআল্লাহু আনহুম* বলে, জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন *কুল্লাউ ওয়াদাল্লাহুল হুসনা* বলে, তারপরে তুমি কটাই মিয়া আর মজর আলি কোন সাহসে তাঁদের নিয়ে সমালোচনা করো?

যারা বুঝে হোক আর না বুঝে সাহাবিগণের সমালোচনা করে, আল্লাহপাক তাদেরকে হিদায়াত দান করুন। আর কপালে যদি হিদায়াত না থাকে, তাহলে যা করা উচিত তাই করুন।

একটি প্রশ্ন

—সাহাবি কাকে বলে?

—যিনি ইমানের অবস্থায় নবিজিকে দেখেছেন; অথবা ইমানের হালতে থাকা অবস্থায় নবি যাকে দেখেছেন।

—হাজির ও নাজির কাকে বলে?

—যিনি সব জায়গায় থাকেন সকল কিছু দেখেন।

—আমরা কি কেউ সাহাবি?

—না

—কেন নই?

—কারণ, আমরা কেউ নবিকে দেখিনি।

—নবি কি আমাদের দেখেছেন?

—না।

—নবি যদি সব জায়গায় থাকেন আর সব কিছু দেখেন, তাহলে তো আমাদেরও দেখবার কথা। আমাদেরও সাহাবি বনে যাওয়ার কথা। হতে পারছি না কেন?

কিছু কি পরিষ্কার হলো? যাদের কাছে হওয়া দরকার?

তাকলিদ বা অনুসরণ

অনুসরণ কার?

করতেই হবে কেন?

কারণ, এ ছাড়া উপায় নেই। নামাজ পড়বেন? রোজা রাখবেন? ইসলামের বিধিবিধান পালন করবেন? সেভাবে করতে হবে, নবি যেভাবে করেছেন। একচুল বাড়াতেও পারবেন না, কমাতেও পারবেন না। সুতরাং অনুসরণ হবে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর, আর কারও নয়!

এখন প্রশ্ন হলো, নবির অনুসরণের উপায় কী?

এখানেই আমাদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব। আমরা বলি রাসুলের অনুসরণ করার জন্য অপরিহার্য মাধ্যমগুলো ফলো করতে হবে। তারা বলে ডাইরেক্ট অ্যাকশন! আফসোস, ক্লাস ফাইভের ছোট্ট একটা বাচ্চাও বুঝে লাফ দিয়ে গাছের আগায় চড়া যায় না, সিঁড়ি বেয়ে ওঠতে হয়। বুঝে না খালি নব্য পণ্ডিতের দল।

নবির নামাজ ফলো করব আমরা। দেখতে হবে সাহাবিরা কীভাবে নামাজ আদায় করেছেন। রোজা রাখব? সাহাবিদের কাছ থেকে জানতে হবে রোজার নিয়মকানুন। হজ করবেন, তাঁদেরকেই ফলো করতে হবে। তাঁদেরকে ফলো করা মানেই রাসুলকে ফলো করা। রাসুল ছিলেন জীবন্ত কুরআন, আর তাঁরা সবাই মিলে ছিলেন রাসুলের কমপ্লিট আদর্শ। নামাজের কথাই ধরি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صلوا كما رأيتموني أصلي.

তোমরা নামাজ পড়ো আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখো।[১৬]

আহাফিরা বলে, আমরা ফলো করব শুধুই রাসুলকে। আমার সদ্য-পণ্ডিত বন্ধুর কথা মনে আছে তো? যার সঙ্গে গল্প বলার গল্প আপনাদের শুনিয়েছিলাম? তার সঙ্গে

---

[১৬] *সহিহ বুখারি :* ৭২৪৬।

কথা হচ্ছিল এই বিষয়ে। সে-ও তোতা পাখির মতো আমাকে বলল, আমরা সরাসরি রাসুলের নামাজ ফলো করব, ব্যস।

—আচ্ছা, ভালো কথা। তাহলে পড়ো রাসুলকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখেছিস।

—সেভাবেই তো পড়ি।

—সেভাবেটা কীভাবে?

—রাসুল যেভাবে পড়েছেন।

—তুই রাসুলকে নামাজ পড়তে দেখলি কোথায়?

—দেখতে হবে কেন? সহিহ হাদিস আছে না?

—হাদিসটা তুই কই পাইলি?

—হাদিস শরিফে।

—সেটা কি তোর নানাজান বর্ণনা করেছেন?

—মানে কী?

—মানে হচ্ছে হাদিসটা কি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তোর মায়ের আব্বাজান নিজ কর্ণে শুনিয়া হাদিস শরিফে লিখিয়া গিয়াছিলেন?

—আমার নানাকে শুনতে হবে কেন? সাহাবিগণ শুনেছেন।

এবার রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে। ধরতে আর ছাই লাগবে না। বললাম—

তাহলে কি সাহাবিগণকে জিজ্ঞেস করে জানা দরকার না, রাসুলকে তাঁরা কীভাবে নামাজ পড়তে দেখেছেন?

—ইয়ে, মানে...

—তাহলে স্বীকার করছিস সাহাবিগণের বক্তব্য ছাড়া রাসুলের নামাজ পাওয়া সম্ভব না?

—ইয়ে, মানে, সহিহ সনদে হলে...

—আবার প্যাঁচ লাগাছ কেন? আমরা কথা বলছি পাবলিক প্লেসে। পাবলিক সনদ-মতন, জরাহ-তাদিল বুঝে না। পাবলিক বুঝে শুদ্ধ-অশুদ্ধ। শুধু এটুকু বল, সাহাবিগণ ছাড়া রাসুলের নামাজ পাওয়া অসম্ভব।

—আচ্ছা।

—আচ্ছা মানে কী? 'হ্যাঁ' বল।

—আচ্ছা হ্যাঁ।

—তাহলে আমরা দুজনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, সাহাবিগণের কথাকে দলিল হিশেবে মানতে হবে।

—আমরা আরেকদিন এ নিয়ে কথা বলি?

—কথা তো কিছু বলার বাকি নেই... আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে হাঁটা ধরল!

এই হলো অবস্থা। এই যখন অবস্থা, সাহাবিগণ ছাড়া শরিয়তের কোনো একটি বিধানও আমলে নেওয়া সম্ভব না, তাহলে মুসলমানদের জন্য কি অপরিহার্য নয় এই তবকাটিকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখা?

কপালপোড়ারা তো বুঝে না। আমরাও এখন এসব নিয়ে বেশি কিছু বলি না। তোদের মানা না মানায় বিশ্বনবির সাহাবিদের কিছু যায় আসেও না। তুই তাদের অনুসরণ করবি কিনা তোর ব্যাপার।

ইজমা কিয়াস আবার কেন

'কুরআন-হাদিস ঠিকাছে। আরও দুইটা আবার কেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে বিদায় হজের ভাষণে পরিষ্কার ভাষায় বলে গেছেন—

> تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله و سنة رسوله.
>
> আমি তোমাদের জন্য কুরআন-হাদিস রেখে যাচ্ছি। এই দুইটা আকড়ে ধরে রাখলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।[১৭]

সেখানে আবার ইজমা-কিয়াসের আমদানি করা লাগে কেন? কুরআন-হাদিস কি তবে যথেষ্ট নয়?'

এটা হলো আহাফিদের আরেক প্রকার ভেলকিবাজির পাবলিসিটি। তারা যখন এভাবে বলে, পাবলিক ভাবে, কথা তো ঠিক। কুরআন-হাদিস থাকতে অন্য কিছু লাগবেই-বা কেন?

এখানে প্রথম জালিয়াতিটা করা হয় হাদিসের তর্জমায়। হাদিসের বাক্যে রাসুল বলেছেন, *কিতাবাল্লাহ ওয়া সুন্নাতা রাসুলিহ*। অর্থাৎ, আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন এবং রাসুলের সুন্নাত। এখানে তারা সুন্নাতের পরিবর্তে 'হাদিস' শব্দ দ্বারা অর্থ করে। আর হাদিস ও সুন্নাত যে সর্বাংশে এক নয়, এটা তো এখন আপনারাও জানেন।

কুরআন-হাদিস থাকতে ইজমা-কিয়াস, মাজহাব-ইমাম, এগুলোর দরকার কী—বলে

---

[১৭] *মিশকাত*: ১৮৬।

লম্পঝম্প করা, ওয়াসওয়াসার লন্ড্রিতে আকিদার ড্রাই ওয়াশ করা স্বশিক্ষিত এই পণ্ডিতরা আবার সহিহ হাদিসের স্লোগান দেন। মজার ব্যাপার হলো এদের অধিকাংশই জানে না 'সহিহ হাদিস' কারে কয়। জিজ্ঞেস করে দেখুন বলবে, 'সহিহ হাদিস' মানে 'শুদ্ধ হাদিস'। আর ইলমে হাদিসের আঙিনায় এসে কেউ যদি বলে 'সহিহ হাদিস' মানে 'শুদ্ধ হাদিস', তাকে অভিশপ্ত আবু জাহিল থেকেও নিকৃষ্ট বলা ছাড়া উপায় থাকবে না।

আবু জাহিলরা নবিকে 'নবি' না মানলেও সত্যবাদী মানত। স্বীকার করত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভুল কথা বলেন না। আর আমার দেশে, দেশবিদেশে যে পণ্ডিতরা 'সহিহ হাদিস' মানে বুঝে 'শুদ্ধ হাদিস', সেই গণ্ড জাহিলরা যে 'নবির দিকেই আবু লাহাবি আঙুল তুলছে, আমরা জানি না তারা এটা জানে কি না! এই পণ্ডিতদের উচিত পুরোদমে শয়তানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নেওয়া। কারণ, নবির হাদিসকে মিথ্যায়িত করা শয়তানের কাজ। এতে করে শয়তান খুশি হয়। আর 'আল্লাহকো রাজি করনা আওর শয়তানকো-ভি নারাজ না-করনা'—দুটো একসঙ্গে হয় না।

দু-রঙ্গি ছুড়দে একরঙ্গি হো-যা
সরাসর মোম হো ইয়া পির সঙ হো-যা!

তারা কুরআন-হাদিসে ইজমা-কিয়াস খুঁজে পায় না। অবশ্য শরিয়তের নীতিনির্ধারণী উসুলগুলো ইন্টারনেটে খুঁজে পাওয়ার কথাও না। সুরা নিসার সেই ৫৯ নম্বর আয়াতেই আল্লাহ বলেন,

﴿اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ﴾

আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসুলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম।

আর কোনো দিকে না তাকালেও শুধুমাত্র এই আয়াত থেকেই শরিয়তের চার দলিল, কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস পাওয়া যায়। কোনো-বিষয় যদি কুরআন-সুন্নাহে খুঁজে পাওয়া না যায়, তখন উলুল আমরদের (ইসলামি জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ উলামা/ফুকাহা) দ্বারস্থ হতে হবে। উলুল আমরগণ 'কুরআন-হাদিসের মৌলিক কোনো বিধানের বিপরীত না হয়'—এই নীতিকে সামনে রেখে নিজেদের বিবেক খাটিয়ে উদ্ভূত বিষয়ে ফয়সালা দেবেন। যেহেতু তাঁরা তাঁদের বিবেক খাটিয়ে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত দেবেন, তাই হতে পারে সকলের কাছ থেকে একই সিদ্ধান্ত আসবে অথবা পরস্পর-বিরোধী। ঐকমত্যে হলে সেটার নাম হয় ইজমা, আলাদা হলে সেটা হবে কিয়াস। শরিয়তে ইজমা-কিয়াস সাহাবিগণের যুগ থেকেই চলে আসছে। এখনো আছে। কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। চলতেই হবে। কারণ, মুসলমানের জিন্দেগি মুসলমানি তরিকায় যে চালাতে হয়।

হাদিস মানি, কোন হাদিস

তাদের দাবি, শুধুই নবির হাদিস দলিল। আমরা বলি, নবির হাদিস তো দলিলই, সাহাবিদের কথা এবং কাজও দলিল। এই দলিলের পক্ষে দলিল হলো স্বয়ং নবির হাদিস। ইনতেকালের আগে নবিজি বললেন, আমার সাহাবিরা শোনো! আমি চলে যাওয়ার পর উম্মতের মধ্যে অনেক ব্যাপারে মতানৈক্য দেখতে পাবে তোমরা। তখন তোমরা আমার এবং খুলাফায়ে রাশেদার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ো[১৮]—

عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين،عضوا عليها بالنواجذ.

তাহলে কেমন করে বলা হয়, 'আমরা সাহাবিদের হাদিসকে দলিল হিশেবে গ্রহণ করব কেন'? নবিকে মানলাম কিন্তু নবির নির্দেশ মানলাম না; এটা কেমন নবি মানা হলো?

অবশ্য মুখে তারা অস্বীকার করলেও চিপায় পড়লে ঠিকই মানে। অনেক মাসআলা দিয়ে উদাহরণ দেওয়া যাবে। তাদের এই দ্বৈতাচরণের কথা পুরো বই জুড়েই থাকবে।

বলা হবে, নবিজি তো খুলাফায়ে রাশেদা তথা আবু বকর, উমর, উসমান আলির সুন্নাত মানার কথা বলেছেন। বাকিদের কথা কেন মানতে হবে?

বাকিদের কথা মানতে হবে কারণ, বাকিদের কথা অন্য হাদিসে বলেছেন,

أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.

আমার সাহাবিগণ আকাশের তারকা বিশেষ, তোমরা তাদের যে কারও অনুসরণ করো না কেন হিদায়াত পেয়ে যাবে।[১৯] তা ছাড়া সকল সাহাবির জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘোষণা দেওয়া আছে। তাদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা করে রেখেছে পবিত্র কুরআন। তবুও যদি কেউ বলেন, আমরা অমুক সাহাবিকে সঠিক মনে করি না, তমুক সাহাবির মাঝে এই-সেই বিচ্যুতি ছিল, বলুক। যেমন খুশি চলুক। যার যার পিঠে তো যার যার চামড়া। কবর থেকেই তো শুরু।

এবার চলুন খুলাফায়ে রাশেদার চারটি ফয়সালার কথা শুনি, যেগুলোকে সম্মিলিতভাবে সাহাবিগণ বিনাবাক্যে মেনে নিয়েছিলেন, যেগুলো আজ আমাদের জন্য শরিয়তের অংশ।

চার খলিফার চার ফয়সালা

খলিফাতুল মুসলিমিন সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছেন। ওসিয়ত করলেন জানাজা পড়ে আমাকে নবির কদমে পেশ করে দাফন করার জন্য অনুমতি

---

[১৮] *ইবনে মাজাহ* : ৪৪; *তিরমিজি* : ২৮১৫।

[১৯] *তালখিসুল হাবির* : ২৫৯৪।

চাইবে। যদি অনুমতি মিলে তবেই হুজুরের পাশে আমাকে কবর দিয়ো। অনুমতি পাওয়া না গেলে জান্নাতুল বাকিতেই দাফন করে নিয়ো।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাহ. *তাফসিরে কবিরে* লিখেছেন, আবু বকরের লাশ যখন রওজা মুবারকের সামনে হাজির করা হলো। সাহাবিগণ আরজ করলেন, 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ, সিদ্দিককে আপনার দরজায় নিয়ে এসেছি। কী করব?'

রওজা থেকে আওয়াজ এলো—

أدخلوا الحبيب إلى الحبيب.

বন্ধুকে বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দাও।[২০]

নবিজি কবরে জিন্দা আছেন নাকি মুর্দা—আমরা বলি জিন্দা, তারা বলে মুর্দা। সাধারণ মুসলমান বিভ্রান্ত। এদিকেও আলিম ওদিকেও আলিম—আমরা এখন কোন দিকে যাব? আমরা বলি সেদিকেই যান নবিজি যেদিকে যেতে বলেছেন। নবি বলেছেন,

عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين.

আলাইকুম বি-সুন্নাতি ওয়া সুন্নাতিল খুলাফাইর রাশিদিনাল মাহদিয়্যিন।

আবু বকরে লাশের মাধ্যমেও ফয়সালা হয়ে গেল নবি কবরে জিন্দাই আছেন। এই ঘটনা থেকে 'হায়াতুন নবি' প্রমাণিত হওয়া ছাড়াও সাহাবিগণও যে দলিল; বরং আসহাবে রাসুল মারা যাওয়ার পর তাঁদের লাশ থেকেও উম্মতের সমস্যার সমাধান মিলে—সেটাও বোঝা গেল। যদিও তারা বুঝবে না। হতেই পারে, খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম। যা হোক, আমরা তাদের কল্যাণ চাই, হিদায়াতের দুআ করি।

এখানে 'আবু বকরে লাশের মাধ্যমেও' বাক্যটিকে বাংলা ব্যায়াকরণিকদের কাছে ভুল মনে হচ্ছে জানি। এখানে 'ও' অব্যয় যোগে না হয়ে 'ই' প্রত্যয় যোগে বলা উচিত ছিল। 'মাধ্যমেও' না বলে বলা দরকার ছিল 'মাধ্যমেই'।

বলে দিই, এখানে 'ও' অব্যয়ের নেপথ্য কথা হলো, শুধু এই ঘটনা দ্বারাই 'হায়াতুন নবি' প্রমাণিত নয়, হায়াতুন নবির প্রমাণে কুরআন-হাদিসে আরও অনেক অনেক দলিল বিদ্যমান। সেদিকে আন্তঃনজর রেখেই 'ই'-এর জায়গায় 'ও' বলা হয়েছে।

দুই

একসঙ্গে একই বৈঠকে তিন তালাক দিলে এক তালাক হয় নাকি তিন তালাক হবে? বিবেক বলে, তিন দিলে তিন হওয়ার কথা। বিশ্বনবির হাদিস বলে, তিন মানে তিন।

---

২০ *তাফসিরে কবির* : ৭/৪৩৩।

আবু হানিফা বলেন তিন বললে তিনই হবে। আহাফিরা বলে, এক বৈঠকে তিন তালাক বললে এক তালাক হবে! পাবলিক সন্দিহান। কোন দিকে যাব? আমরা বলি সেদিকেই যান, নবি যেদিকে যেতে বলেছেন। ইখতিলাফ হলে খুলাফায়ে রাশেদার কাছে যান। 'তিন তালাক বললে তিন তালাকই হয়', এই ফয়সালা উমর ইবনুল খাত্তাবের।

কোন উমর?

সেই উমর, যাঁর শানে রাসুলুল্লাহ বলেছেন,

إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه.

আমার উমর বলেও ঠিক, ভাবেও ঠিক।[২১]

আহাফিরা উমরের সিদ্ধান্তের দিকে যায় না। কেন যায় না? কারণ... হতে পারে, নবি বলে গেছেন—

إني أنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر.

উমর যেদিকে যান, শয়তান সেদিকে যায় না। না জিন শয়তান, না মানুষ শয়তান।[২২]

মানুষ শয়তানকে কি আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার আছে!

তিন.

জুমআর আজান একবার হবে, না দু-বার? হানাফিগণ বলেন আজান হবে দু-বার। তারা এক আজানের পক্ষপাতি। সাধারণ মুসলমানের প্রশ্ন, আমরা এখন কী করব? আমরা বলি তাই করুন নবিজি যা করতে বলেছেন।

عن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المسجد.

জুমআর দ্বিতীয় আজানের সুচনা করেন উসমান রা.।[২৩]

চার.

তারাবিহ ৮ না ২০ রাকআত? কেউ বলছি ২০ রাকআত কেউ বলছে ৮ রাকআত। আমজনতা বিব্রত, 'আমরা এখন কার কথা মানব'?

---

[২১] *তিরমিজি* : ৩৯২৯।

[২২] প্রাগুক্ত : ৩৯৩৮।

[২৩] *সহিহ বুখারি* : ৮৩৬।

আমরা বলি নবির কথাই মানুন। আলাইকুম বি-সুন্নাতি... আলি রা.-এরও ফয়সালা তারাবিহ ২০ রাকআত। *তিরমিজি, মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, মুসনাদুল ইমাম জায়েদ*-সহ অন্য কিতাবাদিতে হাদিস বিদ্যমান। *মুসনাদে ইমাম জায়েদে* উল্লিখিত হাদিসকে আমরা বিশেষ নজরে মূল্যায়ন করতে চাই। কারণ, আমার মনে হয় না এরচেয়ে ভালোবাসার সনদ আর কোনোভাবে হতে পারত। হাদিস বর্ণনাকারীদের সবাই আহলে বায়ত তথা নবি-পরিবারের সদস্য। যে চার বর্ণনাকারী জায়েদ, আলি, হুসাইন, আলি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তারা হলেন জায়েদ বিন আলি বিন হুসাইন বিন আলি। এর মানে হাদিসটি নবি-পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। আর বলা হয়েছে তারাবিহ ২০ রাকআতই। সুতরাং যারা তারাবিহ ২০ রাকআত মানে না, নবি, সাহাবি, আহলে বায়তসহ কারও সঙ্গেই তারা তাদের সম্পর্কের দাবি করতে পারে না।[২৪]

✧✦✧

[২৪] মূলত ২০ রাকআত তারাবির ব্যাপারে ইজমায়ে সাহাবা হয়েছিল হজরত উমরের সময়ে, তাঁরই নেতৃত্বে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত কথা হবে তারাবিহ অধ্যায়ে।

ইমাম মানব কেন

সাহাবিগণকে নাহয় মানলাম; কিন্তু ইমাম মানতে হবে কেন? ইমাম মানতে হবে সাহাবিগণকে মানার জন্য। সাহাবিদের মাইনাস করে যেমন রাসুল মানা সম্ভব হয় না, ইমাম না মানলে সাহাবিদেরও মানা অসম্ভব। কীভাবে দেখুন।

বিভিন্ন মাসআলায় দেখা যায় সাহাবিগণের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। দুজন সাহাবির মধ্যে একজনের মত অন্যজনের উলটা। একসঙ্গে দুজনের কথা আমলে নেওয়া যাচ্ছে না, আবার দুজনের কাউকেই এড়িয়ে যাওয়া করা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় কোন সাহাবির কথা মানা হবে? ইমাম না মানলে এই সমস্যার সমাধানের কোনো পথ খোলা থাকে না।

পন্ডিতরা বলবে, যে সাহাবির কথা বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হবে সেটাকে আমলে নিলাম; অন্যজনের কথাকে অস্বীকার করলাম না, তবেই তো হয়ে গেল।

আল্লাহর নবির দুজন সাহাবির কথাকে কম্পেয়ার করে উত্তম-অনুত্তম সাব্যস্ত করার অধিকার কার আছে? তোমার/আমার মতো সাধারণ সলিমুদ্দির? নাকি এটার জন্যও কোনো যোগ্যতার মাপকাঠি থাকা উচিত? ঘিলুতে কি ঢুকল—মুজতাহিদ ইমামের দরকার আছে কেন?

পরের কথা, তুমি সরাসরি সাহাবির অনুসরণ করতে চাও ভালো কথা? তা বাবা কোন সাহাবির করবে? আবু বকরের? তাহলে আবু বকর সিদ্দিকের পর উমরের যুগে যে সিদ্ধান্তগুলো আসলো, সেগুলোর কী হবে?

উমরের অনুসরণ করবে? উসমানের সময়কার মাসআলাগুলো আমলে নেবে কীভাবে? উসমানের করবে? আলির শাসনামলের বিষয়াদির কী হবে? বিশ্বনবির নির্দেশনা—*আলাইকুম বি-সুন্নাতি ওয়া সুন্নাতিল খুলাফাইর-রাশিদিনাল মাহদিয়্যিন*-এর আলোকে অন্তত খুলাফায়ে রাশেদার অনুসরণ তো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাধ্যতামূলক—তাই না? তাহলে স্পেসিফিকলি অনুসরণটা কার করবে তুমি? একজনের করলে তো অন্যজনের করা যাচ্ছে না। আবার ভিন্নমতের কারণে সকল মাসআলায় সকলের কথা

আমলেও নেওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থায় হাবুডুবু খাওয়া ছাড়া তোমার কি আর উপায় থাকবে?

ইমামের অপরিহার্যতার ব্যাপার বুঝতে চাইলে খুব সহজেই বুঝে ফেলা যায়। চার খলিফার পর ইমাম-যুগের সূচনা। ইমামের সামনে চার খলিফাই ছিলেন। অন্যান্য সাহাবিগণও ছিলেন। যে কারণে ইমামের পক্ষে সম্ভব ছিল সকলের মতামত ও সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে সবগুলোর সমন্বয়ের মাধ্যমে আমাদের জন্য মাসআলা বের করে দেওয়ার। আর ঠিক এই কাজটিই করে গেছেন ইমামে আজম আবু হানিফাসহ অন্য ইমামগণ।

আবারও প্রশ্ন ওঠাবে, মুজতাহিদ ইমামগণ বা উলামা-ফুকাহাকে শরিয়তের সিদ্ধান্ত দেবার অধিকার দিলো কে?

দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন—

﴿اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ﴾

অনুসরণ করো আল্লাহর, রাসুলের আর উলুল আমরদের। [সুরা নিসা : ৫৯]

'উলুল আমর' মানে উলামা এবং ফকিহগণ। এই তাফসির আমি নিজে থেকে করছি না। করেছেন নবির সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। উলুল আমরের তরজমায় বলেছেন[২৫]—

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس [وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ] يعنى أهل الفقه والدين، وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصرى وأبو العالية [وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ] يعنى العلماء.

আর কোনো আয়াতের তাফসির যদি কোনো সাহাবি করেন, তাহলে সেটার পরে কোনো পণ্ডিতের পণ্ডিতি ধোপে টেকে না।

আচ্ছা কিছু সময়ের জন্য ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যা ভুলে গেলাম। যারা বলেন আমরা কুরআন হাদিস ছাড়া আর কোনো দলিল মানি না, তাদেরকে বলুন, আল্লাহ বলছেন কুরআন মানো, হাদিস মানো আর উলুল আমরদের মানো। আমরা সাহাবিদের ব্যাখ্যানুযায়ী 'উলুল আমর' মানে মুজতাহিদ ফুকাহা বুঝেছিলাম। তোমরা মানছ না। থাক মানার দরকার নেই। সবাইকে সব কথা মানতেও হয় না। সব আদেশ সবার জন্যও না। উলুল আমরদের মান্য করার আয়াত শুরু হয়েছে *ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা*

---

[২৫] *তাফসিরে ইবনে কাসির* : ১/৫১৮।

আমানু দিয়ে। এখন বলো, 'উলুল আমর' মানেটা কী? উলামা-ফুকাহা না হলে উলুল আমরের একটা কিছু অর্থ তো থাকতে হবে। সেই অর্থটা তাহলে কী?

তারা বলবে, এখানে হাকিমে আদিল বা ন্যায়বিচারকদের কথা বলা হয়েছে।

মেনে নিলাম তোমাদের ব্যাখ্যা। কিন্তু তাতেও যে 'উলুল আমর' মানে উলামা-ফুকাহাই সাব্যস্ত হয়ে যান, এটা কি খেয়াল করেছ? যে হাকিম দীনি কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন তাকে তো জানা থাকতে হবে মাসআলাটি। না জানলে ফয়সালা দেবেন কীভাবে?

এখন তিনি যদি নিজেই জানেন, তাহলে তিনি আলিম। তার মানে উলুল আমর মানে আলিমই হলো। আর যদি তিনি অন্য আলিমের কাছ থেকে জেনে নিয়ে ফয়সালা দেন, তাহলে একটু ঘুরে আলিমের কথাই মানা হলো। মোদ্দাকথা, যে ব্যাখ্যা করা হোক আর যে ভাষাতেই করা হোক, উলুল আমর মানে উলামা-ফুকাহা বলা ছাড়া কোনো উপায় নেই। চমৎকার এই ব্যাখ্যাটি করেছেন ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি *তাফসিরে কবিরে*।[২৬]

ইমাম না মানলে দীন মানার উপায় নেই

বুখারি শরিফের কথাই বলি। বুখারি বুঝলে বাকিগুলা বোঝা সহজ হয়ে যাবে কারণ, ধরে নেওয়া হয় কুরআনে কারিমের পর শ্রেষ্ঠ কিতাবের নাম *সহিহ বুখারি*।

এই যে আমি বললাম, কুরআনের পর সবচেয়ে সহিহ কিতাবের নাম *বুখারি*, এটাও কিন্তু কুরআন-হাদিসের কথা নয়। কুরআন-হাদিসের কোথাও বলা নেই কুরআনের পরপরই *সহিহ বুখারির* অবস্থান। এই কথাটিও উম্মতের আলিমগণের ইজমার মাধ্যমে প্রচারিত। তারা ইজমা বুঝে না আবার *বুখারি* শ্রেষ্ঠ—এটা বোঝে। আসলে তারা কী বুঝে আর কী বুঝে না, সেটাই বোঝার উপায় নেই!

এখানে এই কথাটিও মনে রাখতে হবে, আল্লাহর নবির হাদিস মানেই শুধু *বুখারি* নয়। শত শত হাদিসের কিতাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সব হাদিসই সম-মর্যাদার। হাদিস যদি সঠিকভাবে হাদিস সংকলকের কাছে এসে পৌঁছে থাকে, তাহলে সেটা *বুখারিতে* পাওয়া গেল নাকি *তিরমিজিতে*, *তাহাবিতে* নাকি *মুসনাদে ইমাম জায়েদে*, সেটা বিবেচ্য নয়।

তাদেরকে কিছু বললেই বলবে, হাদিস দেখাও। কুরআন অথবা *সহিহ বুখারি* থেকে দলিল দিতে হবে। আমরা বলি 'দলিল শুধু কুরআন আর *বুখারি* থেকেই দেওয়া লাগবে'—এই কথার পক্ষের দলিল তুই কুরআন অথবা *বুখারি* থেকে আগে দে। একটি আয়াত দেখা কুরআনে, একটি হাদিস দেখা *বুখারিতে* যেখানে বলা আছে দলিল শুধু কুরআন আর *বুখারি* থেকেই দিতে হবে।

---

[২৬] *তাফসিরে কাবির* : ৪/১১৩।

বলছিলাম, ইমাম না মানলে দীন মানার উপায় থাকবে না। ছোট্ট একটি উদাহরণ দিই। তাহলে ব্যাপারটি বুঝতে সমস্যা থাকবে না। দু-রাকআত নামাজের কথাই ধরি।

সারা পৃথিবীর হাদিস বিশারদগণ মিলেও দুই রাকআত নামাজ পড়ার পরিপূর্ণ তরিকা কুরআন বা *বুখারি শরিফ* থেকে বের করে দেখাতে পারবেন না। আমরা যে আজান দিই, *বুখারি*তে কিতাবুল আজান থাকলেও আজানে যে বাক্যগুলো বলা হয়, কেউ দেখাতে পারবে না সেগুলো হুবহু *বুখারি*তে আছে। এর মানে শুধু *বুখারি* নিয়ে বসে থাকলে দু-রাকআত নামাজই পড়া যাবে না। *মুসলিম শরিফ* দেখতে হবে, *আবু দাউদ* খুলতে হবে, *তিরমিজি*, *নাসায়ি*, *ইবনে মাজাহ*র কাছে যেতে হবে। হাদিসের অন্যান্য কিতাবও আমলে নিতে হবে। ঠিক এই কাজটিই আমাদের জন্য করে গেছেন ইমাম আবু হানিফা। করে গেছেন অন্য ইমামগণ।

সব মাসআলা কুরআন-হাদিসে থাকে না

যারা বলেন কুরআন-হাদিসই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আমাদের জন্য আর কিছুর প্রয়োজন নেই, তাঁরা কুরআনও মানছেন না হাদিসও না। কুরআন কেমনে অমান্য করছেন, *আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসুল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম* দ্বারাই পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা। হাদিস থেকে উদাহরণ দেখি—

أخرج الترمذى وأبوداود والدارمى وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن، قال: كيف تقضى إذا عرض لك القضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله، قال فإن لم تجد فى كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجتهد رأيي ولا ألو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله.

মাআজ ইবলে জাবাল রা.-কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইয়ামেনের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিশেবে পাঠাচ্ছিলেন তখন বললেন, 'হে মাআজ, তোমার সামনে যখন কোনো ব্যাপার আসবে ফয়সালা দেবার জন্য, তুমি সেটা কীভাবে দেবে?'

মাআজ বললেন, أقضى بكتاب الله 'আমি কুরআন থেকে সমাধান দেবো।'

রাসুল বললেন, فإن لم تجد فى كتاب الله 'যদি কুরআনে না পাও?'

তিনি বললেন, فبسنة رسول الله 'আল্লাহর রাসুলের সুন্নাত দিয়ে।'

রাসুল বললেন, فإن لم تجد فى سنة رسول الله 'যদি সুন্নাতে না পাও?'

তিনি বললেন, *ফা আজতাহিদু রায়ি*, 'আমি নিজের বিবেক খাটিয়ে ফয়সালা দিয়ে দেবো...'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হলেন। আলহামদুলিল্লাহ বললেন। মাআজ ইবনে জাবালের বুকে হাত রেখে দুআ করে দিলেন।[২৭]

এখানে তিনটি ব্যাপার ইম্পর্টেন্ট

নম্বর ওয়ান

রাসুল বললেন, 'যদি কুরআনে না পাও?' তার মানে সব মাসআলা কুরআনে পাওয়া যাবে না। রাসুল বললেন, 'যদি হাদিসে না পাও?' তার মানে সব মাসআলা হাদিসেও মিলবে না।

নম্বর টু

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, *ফা-ইল্লাম তাজিদ*, যদি কুরআন-হাদিসে না পাও। *ফা-ইল্লাম ইয়াকুন* অর্থাৎ, 'যদি কুরআন হাদিসে না থাকে'—এভাবে বলেননি। এ থেকেই প্রমাণিত হয় মুজতাহিদ যখন ইজতেহাদ করবেন, কুরআন-হাদিস সামনে রেখেই করবেন। তবে হতে পারে বিষয়টি কুরআন-হাদিসে ছিল; কিন্তু তাঁর চোখে পড়েনি। সে অবস্থায়ও তাঁর ইজতেহাদ বৈধ হবে।

নম্বর থ্রি

কুরআন-হাদিসে মাসআলা না পাওয়া গেলে কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? মাআজ ইবনে জাবাল বললেন, 'আমি গবেষণা করে সিদ্ধান্ত দেবো।' রাসুলও সমর্থন জানালেন।

আরেকটি হাদিস লক্ষ্য করি। আলি রা. থেকে বর্ণিত—

> عن على قال: قلت يا رسول الله! إن نزل بنا أمر، ليس فيه بيان أمر ولا نهى، فما تأمرنى؟ قال: شاوروا فيه الفقهاء والعابدين، ولا تمضوا فيه رأى خاصة. رواه الطبرانى.
>
> ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের সামনে যখন এমন কোনো বিষয় আসবে যে ব্যাপারে আদেশ-নিষেধ নেই, সে অবস্থায় আমরা কী করব? হুজুর

[২৭] *আবু দাউদ* : ৩৫৯২; *তিরমিজি* : ১৩৪২।

বললেন, ফুকাহা এবং আবিদীনদের সঙ্গে পরামর্শ করবে।[২৮]

কুরআন-হাদিসেই সবকিছু দিয়ে দিলে...

অনেকের মনেই প্রশ্ন, আল্লাহ তো চাইলে সবকিছু কুরআন বা হাদিসের মাধ্যমে ক্লিয়ার করে দিতে পারতেন। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ১০ লক্ষাধিক হাদিস বর্ণিত আছে। তিনিও তো সবকিছুর পরিষ্কার ফয়সালা দিয়ে দিতে পারতেন। কেন করলেন না?

কেন-এর কারণ

কুরআনের শব্দসংখ্যা সীমিত আর মানুষের সমস্যা অসীম এবং চলমান। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের সামনে নতুন নতুন সমস্যা আসবে। কুরআনে যদি সবগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে রাখতে হতো, কুরআন তবে ৩০ পারায় থাকত না, কম করে হলেও তিন হাজার পারা হতো। এখন আমরা কুরআন বুকে ঝুলিয়ে চলতে পারি, সেটা আর করতে হতো না, কুরআন বহনে ট্রাক বা লরি লাগত। সেটা হতো হাস্যকর একটি ব্যাপার। আল্লাহপাক দীনের বেইসিক সূত্রগুলো কুরআন-হাদিসে বলে দিয়ে বাকিগুলোর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়ে রাখলেন, *উলিল আমরি মিনকুম*।

কেউ যেন এই ভেবে বিভ্রান্ত না হন যে, এখানে ভুল করে হাদিসকেও আল্লাহর বাণী বানিয়ে ফেলা হলো কি না! মোটেও তা নয়। সম্পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গেই কথাটি বলা হয়েছে। যারা জানেন তাঁরা তো জানেনই। যারা জানেন না, তাদের জানানোর জন্য বলি, আল্লাহপাক নবিজির কাছে যত কথা পাঠিয়েছেন, সেগুলো ছিল তিন কোয়ালিটির।

১. শব্দও আল্লাহর, অর্থও আল্লাহর এবং পাঠানো হয়েছে কুরআনিক সিস্টেমে, জিবরিলে আমিনের মাধ্যমে, যার নাম কুরআনে কারিম।

২. অর্থ বা মূলভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে; কিন্তু শব্দ রাসুলের। এটার নাম হাদিসে রাসুল।

৩. শব্দ এবং অর্থ দুটোই আল্লাহর; কিন্তু কুরআনিক ফর্মুলায় আসেনি। অর্থাৎ, যে কথাগুলো জিবরিলকেই নিয়ে আসতে হয়নি। স্বপ্নের মাধ্যমেও এসে থাকতে পারে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলবেপাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামের মাধ্যমেও দেওয়া হয়ে থাকতে পারে; অথবা অন্য কোনো উপায়ে যেটা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই জানেন। আল্লাহপাকের এমন

[২৮] *মাজমাউজ জাওয়াইদ* : ৮৩৪।

বাণীগুলোকে পরিভাষায় আহাদিসে কুদসিয়্যাহ বা হাদিসে কুদসি বলা হয়।

যে প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল। পৃথিবীর বাস্তবতায় হাজার হাজার মাসআলা আছে, আসবে, যেগুলোর সরাসরি সমাধান কুরআন-হাদিসে খুঁজলে পাওয়া যাবে না। উম্মত সেগুলোর সমাধান পাবে কোথা থেকে? আল্লাহ বলেন, চিন্তার কিছু নেই, *উলিল আমরি মিনকুম*।

সরাসরি কুরআন-হাদিসে নেই—উদাহরণ

১. এক লোক মোবাইল ফোনের রিংটোন অন রেখেই নামাজে দাঁড়িয়ে গেল। ইমাম দ্বিতীয় রাকআতে সুরা ফাতিহা শুরু করেছেন, ঠিক তখন তার ফোন বাজতে আরম্ভ করল। এদিকে ভদ্রলোকের রিংটোনে আবার হিন্দি গান সেট করা ছিল। পুরো মসজিদ জুড়ে ছেয়ে গেল গানের সুর! মুসল্লিগণ পড়লেন সমস্যায়। তাদের এক কানে ইমামের সুরা ফাতিহা অন্যকানে 'হিন্দি গানের আওয়াজ..' পুরাই বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা!

   এই অবস্থায় কেউ একজন গেল মুফতি সাহেবের কাছে। যে বস্তু পকেটে নিয়ে নামাজ পড়ার কারণে এই অবস্থা, এই জিনিস পকেটে নিয়ে নামাজ পড়া জায়েজ কিনা? কুরআন-হাদিস কী বলে?

২. গানের কনসার্টে মাইকটি ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে। গানের মাহফিল শেষ হওয়ার পর মাইকটি চলে আসলো ওয়াজ মাহফিলে। সেই একই মেশিন, সেই একই মাইক্রোফোন। কেউ জিজ্ঞেস করল ফতোয়া, যে মাইক্রোফোনে মাত্রই গান গাওয়া হলো, সেই মাইক্রোফোনে কুরআন তিলাওয়াত করা বা তাফসির মাহফিল করা জায়েজ আছে কি না?

৩. নামাজের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদের দিকে গেলে প্রতি কদমে নেকি লেখা হয়। এটা তো হেঁটে যাবার বেলায়। কিন্তু গাড়িতে করে গেলে? তখন নেকির হিসাবটা কেমনে হবে? গাড়ি নিয়ে গেলে নেকি মিলবে না, এভাবে তো বলা যাবে না। তাহলে কেমনে কী? জানতে চাইল কেউ? জিজ্ঞেস করল মাসআলা। কুরআন-হাদিসের আলোকে জবাব চায় সে।

উদাহরণ অনেক টানা যাবে। সারা দুনিয়ার আলিম-উলামা আর মুফতি একত্রে মিলে ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগিয়ে খুঁজলেও কুরআন-হাদিসের কোথাও মোবাইল ফোন বা মাইকের কথা পাবেন না। গাড়ির চাক্কা ঘুরার সঙ্গে নেকির ক্যালকুলেশনের কোনো দলিল পাবেন না। এখন এগুলোর সমাধান আসবে কীভাবে?

প্রাইজবন্ড, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও মাল্টিলেবেল মার্কেটিংয়ে জাকাতের বিধান, মানুষের শরীরের

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানান্তর বা প্রতিস্থাপন, রক্ত দেওয়া—এগুলোর সরাসরি সমাধান তো কুরআন-হাদিসে নেই। এখানেই মুজতাহিদ ইমামগণের ডিউটি। এখানেই উলামা-ফুকাহার কাজ। তারা কুরআন-হাদিসের মূলনীতির মধ্যে থেকে সামঞ্জস্যিক বিষয়ের সঙ্গে কিয়াস করে এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন। আর সেটাই হবে শরিয়তের সিদ্ধান্ত।

চাঁদ দেখা

অনেকের মনেই মাঝেমধ্যে আরেকটি প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারে। প্রতিবছর চাঁদ দেখা নিয়ে সারাবিশ্বে কত ভেজাল হয়! যে কারণে কেউ রোজা রাখে একদিন আগে, কেউ একদিন পরে। ঈদও তাই; অথচ এই ঝামেলাটা তো হয় 'রমজানে রোজা রাখো' বলার কারণে। আল্লাহ যদি বলে দিতেন, রোজা ৩০টি রাখো, তাহলেই তো ঝামেলা চুকে যেত। আসলে ঝামেলা তাতে কমত না বরং আরও বেড়ে যেত। 'রোজা ৩০টা রাখো' বললে যে বছর রমজান মাস হতো ২৯ দিনে, সে বছর ৩০ রোজা পুরা হতো কীভাবে?

বলা হবে, চাঁদ তো আল্লাহর নিয়ন্ত্রণেই। রমজান মাসটা প্রতি বছর ৩০ দিনের করে দিলেই তো আর সমস্যা হতো না!

আসলে আমাদের মাথায় এসব প্রশ্ন আসে কারণ আমরা মাখলুক। আমাদের চিন্তা করার ক্ষমতা সীমিত। আল্লাহ হলেন খালিক। তিনি আমাদের স্রষ্টা। স্রষ্টা জানেন সৃষ্টির রহস্য। যার কায়া, মায়াটা তারই থাকে বেশি। তিনি চান সারাবিশ্বের মুসলমান রোজা রাখার ক্ষেত্রে সমান সুবিধা ভোগ করুক। তাই সৌরবছরের সঙ্গে চন্দ্র বছরের ১১ দিন ব্যবধান তৈরি করে দিয়েছেন। সৌরবর্ষ চন্দ্রবর্ষের চেয়ে ১১ দিন কম বলে প্রতিবছর একই টাইমে রমজান হয় না। ১১ দিন করে পেছন দিকে আসে। এর ফলে রমজানে মৌসুম বদলাতে থাকে। ৩৩ বছর পর আবার সেইম টাইম ফিরে আসে। আমাদের বুদ্ধিতে করা হলে দেখা যেত কেউ সারাজীবন গরমে অতিষ্ঠ হয়ে রোজা রাখছে, আবার কেউ রাখছে আরামের দিনে। কেউ রাখছে ছোট দিনে আবার কেউ লম্বা দিনে। এটা ইনসাফ হতো না।

ইমাম যদি সিদ্ধান্ত দিতে ভুল করেন

সমস্যা নেই। যদি সঠিক সিদ্ধান্ত দেন ডবল সওয়াব পাবেন; আর ইজতেহাদে ভুল করার কারণে সিদ্ধান্ত ভুল দিলে সিঙ্গেল সওয়াব।

জানি খুব সহজে কথাটি হজম করা মুশকিল। টেনশনের কারণ নেই। এটি আমার কথা নয়, বলেছেন স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আগে নবির

কথা শুনুন। তারপর সেটাকে যুক্তির সঙ্গে মেলান। তারপর দেখুন কথাটি কত সহজে বিবেকের সঙ্গে মিশে যায়।

> عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.
>
> রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুজতাহিদ যখন ইজতেহাদ করে কোনো সিদ্ধান্ত দেবেন, হয়তো সঠিক সিদ্ধান্ত দেবেন; অথবা ভুল করবেন। যদি সিদ্ধান্ত সঠিক দেন তাহলে দ্বিগুন সওয়াব পাবেন আর ভুল করলে সিঙ্গেল সওয়াব।[২৯]

'হাকিম যখন ফয়সালা করে এবং ইজতেহাদ করে' এর মানেই হচ্ছে এখানে সেসব ফয়সালার কথাই বলা হচ্ছে যেগুলো শরিয়ত-সংশ্লিষ্ট। তার মানে এখানে হাকিম অর্থ সাধারণ হাকিম নয়। যেকোনো কোর্টের যেকোনো পর্যায়ের হাকিম বা বিচারক শরিয়তের কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন; আর উম্মতকে মেনে নিতে হবে—মোটেও তা নয়। হাকিম মানে যিনি ইজতেহাদ করার মতো ক্ষমতা রাখেন।

ছায়া হাদিস

এক লোক গেছে তার ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে হসপিটালে দেখা করতে। বন্ধুটি আবার সেই হসপিটালের হৃদরোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। সে যখন গেছে বন্ধু তখন হসপিটালে নেই। আর ঠিক তখনই ইমার্জেন্সি বিভাগে হার্টের রোগী একজন এলো। যায় যায় অবস্থা। হার্টে ব্লক হয়েছে। ইমিডিয়েট অপারেশন করা না হলে বাঁচানো মুশকিল হবে।

এদিকে যিনি ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, তিনি আবার ইউটিউব বিশেষজ্ঞ! প্রতিদিন ইউটিউবে একটা করে হার্টের অপারেশন দেখেন। বুঝুন আর না বুঝুন দেখতে তার ভালো লাগে। দেখতে দেখতে হার্টে ব্লক হলে কীভাবে সেটা খুলে দিতে হয়, কীভাবে জোড়াতালি দিতে হয় মোটামুটি মুখস্থ হয়ে গেছে তার। তিনি ঘোষণা করলেন, কোনো সমস্যা নেই, আমিই অপারেশন করে দিচ্ছি।

হসপিটালওয়ালারা রাজি হয়ে গেল।[৩০]

---

[২৯] *সহিহ বুখারি :* ৭৩৫২।

[৩০] মনে করে নিন আ কি। যদিও কোনো হসপিটাল এভাবে রাজি হবে না। আবার হয়েও যেতে পারে যদি দেশটির নাম হয় বাংলাদেশ! রাজধানী ঢাকাতেই কোনো কোনো হসপিটালে বছরের পর বছর নার্স, সুইপারদের দ্বারা অপারেশন কর্ম চালানোর খবরও তো আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে পেয়ে থাকি।

শুরু হলো অপারেশন। আল্লাহর রহমত ছিল রোগীর ওপর। দেখা গেল অপারেশন সাড়ে সাকসেসফুল। ঘটনাটি যখন হসপিটাল কর্তৃপক্ষের কানে গেল, তখন সবাই তিরস্কার করতে লাগল লোকটিকে, 'কী করেছ তুমি? তুমি কি ডাক্তার নাকি? তুমি কোন সাহসে অপারেশন করতে গেলা? যদি কিছু হয়ে যেত?'

সে যতই বলে, 'অপারেশন তো কামিয়াব হয়েছে', কাজ হয় না। সবাই মিলে তাকে দোষারোপই করে।

অন্যদিকে এই ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ সার্জন যিনি, তিনি যদি এই অপারেশন করতেন আর রোগী মারাও যেত, কেউ তাকে দোষারোপ করত না। বলতো—কী আর করা! এটা হতেই পারে। ডাক্তার তো আর খোদা না। তিনি তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। অপারেশন সফল না হওয়ার কারণে ডাক্তারের অপারেশন বিল থেকে এক পয়সাও কেটে রাখা হতো না।

আরও সংক্ষেপ করে উদাহরণ দিলে এভাবে বলা যায়, ইদানীং প্রায়ই নিত্য-নতুন রোগ-বালাইয়ের জন্ম হচ্ছে। এমন সব বেমারের নাম শোনা যায়, বাপ-দাদা চৌদ্দগোষ্ঠীর কেউই যে নাম শুনেনি! এমন কোনো বেমারের চিকিৎসা বা টিকা নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। তাঁর সামনে নতুন রোগী, নতুন রোগ। নতুন ধরণের অসুখ বলে মেডিক্যাল সাইন্সের কোনো বই-পুস্তকেও এটার চিকিৎসার কথা লেখা নেই। ডাক্তারকে তাঁর অভিজ্ঞতা আর অন্যান্য অসুখের উপসর্গের ওপর আইডিয়া করে এগোতে হচ্ছে।

ডাক্তার সফল হলেন। রোগটির চিকিৎসা আবিষ্কার করে ফেললেন। তখন চতুর্দিক থেকে তাঁর জন্য প্রশংসা আর উপঢৌকন আসতে লাগবে। লবিং ভালো হলে নোবেল-টোবেলও পেয়ে বসতে পারেন।

তিনি যদি ভুল করতেন? দিনের পর দিন গবেষণা করে একটা ওষুধ আবিষ্কার করার পর দেখা গেল তাঁর ওষুধ কাজ করছে না। অর্থাৎ, তিনি ভুল ওষুধ আবিষ্কার করে ফেলেছেন, তাহলেও তাঁর নিয়মিত বেতন-ভাতা কর্তন করা হতো না।

এবার আল্লাহর নবির হাদিস সামনে আনুন। মুজতাহিদ ইজতেহাদ করে যদি সঠিক সিদ্ধান্ত দেন, তাহলে তো ঠিকই—ডবল সওয়াব পেতেই পারেন; কিন্তু যদি ভুলও করেন (বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মতো), তাহলেও তিনি যে দীনের একটা মাসআলার পেছনে ঘাম ঝরালেন, রাতের ঘুম ত্যাগ করে রাত জেগে চেষ্টা করলেন, সে জন্যে একটি সওয়াব পাবেন। ব্যাপারটি কি এখন যৌক্তিক মনে হচ্ছে?

তাকলিদ কাকে বলে, কারা করে

তাকলিদ মানে ইজতেহাদযোগ্য মাসআলায় এমন মুজতাহিদ ইমামের দেওয়া সিদ্ধান্তকে বিনাবাক্যে মেনে নেওয়া, যাঁর মুজতাহিদ হওয়া শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রমাণিত এবং তাঁর মাজহাব অনুসারী পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে লিখিত আকারে বিদ্যমান।

কঠিন হয়ে গেছে। আরও সহজ করে বলি। কুরআন-হাদিসে সরাসরি নেই এবং নিজে যাচাই করার ক্ষমতাও নেই, সেসব ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামের কথাকে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়ার নামই হলো 'তাকলিদ'।

ব্যক্তিপর্যায়ের এবং সমষ্টিগত, দু-পর্যায়েই তাকলিদ হয়। তাকলিদ মোটামুটি সবাই করেন। এই পৃথিবীতে এমন একজন লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে কোনো-না কোনো ব্যাপারে কারও-না কারও তাকলিদ করে না। কথা হলো কেউ স্বীকার করে কেউ করে না। কেউ করে একজনের আবার কেউ অনেকের। কেউ করে ব্যক্তিপর্যায়ে আবার কেউ আমলের ক্ষেত্রে।

একটি মানবশিশুর জন্মের পর থেকেই তাকলিদ শুরু হয়ে যায়। সবাই বিষয়টি জানি; কিন্তু সেভাবে ভেবে দেখিনি বলে চোখে পড়ে না। একটু যখন বয়স হয়; দেড় কি দুই বছর—বাবাকে 'বাবা' বলে ডাকতে শুরু করি। তিনি যে বাবা এটা আমরা আমাদের মায়ের কাছ থেকে জানি। মা আমাদের বলেন, 'এটা তোর বাবা।' আমরা মায়ের কথায় আস্থা রাখি। আমরা আমাদের মায়ের কথা মেনে নিই। এই মেনে নেওয়াকেই আরবিতে বলে, 'তাকলিদ'।

আমরা মসজিদে জামাআতে নামাজ আদায় করি। ইমামের পেছনে দাঁড়াই। ইমামের তাকলিদ করি। ইমাম যা করেন আমরা তা-ই করি। ইমাম রুকুতে গেলে আমরাও যাই। ইমাম যখন সিজদাতে যান, আমরাও সিজদাতে যাই। কোনো অবস্থাতেই ইমামকে ডিঙাই না।

ইমাম রুকুতে গেলেন আর কেউ ভাবল, আরে আমি তো গায়রে মুকাল্লিদ! আমি তাহলে ইমামের তাকলিদ করছি কেন? অথবা ইমাম রুকুতে থাকা অবস্থায় তার মনে পড়ে গেল কুরআনের আয়াত فاستبقوا الخيرات 'নেকির কাজে তোমরা একে অন্যের

আগে থাকো।' লা-মাজহাবি ভাইজান ভাবলেন, সিজদা যেহেতু একটা নেকির কাজ, তাহলে আগে চলে যাই। তিনি ইমামের আগেই চলে গেলেন সিজদায়! তাহলে তো নামাজই হবে না।

এখন কোনো পাগল যদি মসজিদে জামাআতে নামাজের দৃশ্য দেখে আর বলে, 'অমুক মসজিদে দেখেছি অনেকে মিলে একজন ইমামকে সিজদা করছে', তাহলে তার কথায় কেউ কান দেবে না। পাগল তো পাগলামি কথা বলবেই। কিন্তু কোনো সুস্থ মানুষ যদি বলে 'মুকতাদিগণ ইমামকে সিজদা করে শিরক করছেন', তাহলে বিবেকবান লোকজন তাকে ধরে পাগলের সঙ্গে একই গাড়িতে চালান করে দেওয়ার কথা ভাববে। কারণ, মুকতাদিগণ মোটেও ইমামকে সিজদা করছেন না। ইমামের অনুসরণ করে ইমামের নেতৃত্বে আল্লাহকেই সিজদা করছেন।

এই কথাটি বুঝলে মাজহাব না-বোঝার তো কোনো কারণ নেই। মাজহাবের অনুসারীগণ ইমামের ইবাদত করেন না। ইমামের দেখিয়ে দেওয়া পথে রাসুলের সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদতই করেন। ইমামের অনুসরণের মাধ্যমে কুরআন-হাদিসে আমল করেন। ইমাম কুরআন-হাদিসকে পাশ কাটিয়ে তাঁর পকেট থেকে কিছু বের করে মাজহাব বানাননি। মাজহাব মানে পথ, যে পথে হাঁটলে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সহজে পাওয়া যায়, উদ্দিষ্টে পৌঁছা সহজ হয়।

এখন কেউ যদি এমন হন, যিনি নিজে-নিজেই কুরআন-হাদিস ঘাঁটাঘাটি করে শরিয়তমতো জীবনযাপনে সক্ষম, তাহলে তাঁর জন্য কোনো মাজহাব ফলো করার দরকার নেই। কারণ, তিনি তখন মুজতাহিদ; আর মুজতাহিদকে কারও অনুসরণ করা লাগে না।

এই শেষ কথাটি বুঝে ফেললে যে জাহিলগণ বলে, 'মাজহাব মানা জরুরি হলে ইমাম আবু হানিফা কার মাজহাব মানতেন'—এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে আর কারও বাড়িতে যাওয়া লাগবে না। আবু হানিফা নিজে মুজতাহিদ ছিলেন; আর মুজতাহিদের জন্য মাজহাব মানতে হয় না। কারণ তিনি মুজতাহিদ। ঠিক যেভাবে আমাদেরকে মুসলমান হওয়ার জন্য নবির কালিমা পড়তে হয়; কিন্তু নবিকে সেই কালিমা পড়া লাগে না। কারণ তিনি স্বয়ং নবি।

তাকলিদের দলিল

তাকলিদ বা অনুসরণ দুই প্রকার : এক হলো তাকলিদে শাখসি বা ব্যক্তিগত অনুসরণ এবং দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে তাকলিদে ইজতেমায়ি বা সমষ্টিগত অনুসরণ। প্রথমে সমষ্টিগত তাকলিদের কিছু দলিল দেখে নিই। ব্যাখ্যা ছাড়া শুধুই দলিলগুলো উল্লেখ করি।

এক.

﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴾

হে আল্লাহ, আমাকে সোজাপথে চালান। [সুরা ফাতিহা : ৫]

সেটা কোন পথ ব্যাখ্যা আছে ঠিক পরের আয়াতেই, *সিরাতাল্লাজিনা আন-আমতা আলাইহিম।* সেই পথ যে পথে চলেছেন তোমার কাছ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্তরা। তাঁরা কারা? ব্যাখ্যা আছে সুরা নিসার ৬৯ নম্বর আয়াতে—

﴿الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ﴾

নবিগণ, সাহাবিগণ, শহিদগণ এবং নেককার—চারশ্রেণিকে বলা হচ্ছে পুরস্কারপ্রাপ্ত। সুতরাং তাকলিদ না করে সিরাতে মুস্তাকিম পাওয়া এবং প্রতিষ্ঠিত থাকার উপায় নেই। অবশ্য কারও যদি সিরাতে মুস্তাকিম ছাড়া অন্য কোনো শর্টকাট জানা থাকে, তাহলে তার কথা আলাদা। (এ নিয়ে আরও কথা হবে তরকে কিরাআত খালফাল ইমাম অধ্যায়ে)

দুই.

﴿اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ﴾

কথা মানো আল্লাহর, কথা মানো রাসুলের এবং উলামা-ফুকাহার।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা একাধিকবার করা হয়েছে।

তিন.

﴿فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

না জানলে আলিমদের জিজ্ঞাসা করো। [সুরা নাহল : ৪৩]

যেসব গবেষণালব্ধ মাসায়িল নিজে নিজে বের করার ক্ষমতা থাকবে না, ওইগুলো মুজতাহিদগণের নিকট থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে।

চার.

﴿وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا﴾

এবং তাঁরা আরজ করেন, হে আমাদের প্রভু, আমাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের দ্বারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দাও এবং আমাদেরকে পরহেজগারদের ইমাম বানিয়ে দাও। [সুরা ফুরকান : ৭৪]

ইমাম তখনই হওয়া যায় যখন তাকলিদ করার মতো অনুসারী থাকেন।

পাঁচ.

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ﴾

তাদের প্রত্যেক গোত্র হতে একটি দল ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কেন বের হয় না, যারা জ্ঞানর্জন করে ফিরে এসে নিজ গোত্রকে ভীতি প্রদর্শন করবে, যাতে গোত্রের অন্যান্য লোকজন পাপাচার থেকে দূরে থাকতে পারে। [সুরা তাওবা : ১২২]

ছয়.

﴿وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِي الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ﴾

এবং যদি এ ক্ষেত্রে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ফকিহদের শরণাপন্ন হতো, তাহলে তাঁদের মাঝে যাঁরা সমস্যার সমাধান বের করার যোগ্যতা রাখে, তাঁরা এর গূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারত। [সুরা নিসা : ৮৩]

সাত.

﴿يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۢ بِاِمَامِهِمْ﴾

যে দিন আমি প্রত্যেক দলকে নিজ নিজ ইমামসহ ডাকব। [সুরা ইসরা : ৭১]

তাফসিরে রূহুল বয়ানে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছে—

اَوْمُقَدَّمٍ فِي الدِّيْنِ فَيُقَالُ يَا حَنَفِيُّ يَاشَافِعِيُّ.

ইমাম হচ্ছেন ধর্মীয় পথের দিশারী, তাই কিয়ামতের দিন মানুষকে 'হে হানাফি, হে শাফিয়ি' বলে আহ্বান করা হবে।[৩১]

রুহুল বয়ানের ভাষ্য অনুযায়ী বলা যায়, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর ইমামের সঙ্গে ডাকা হবে। যাদের ইমাম নেই তাদের কী হবে কে জানে।

---

[৩১] *রুহুল বায়ান* : ৫/১৮৭।

আট.

أخرج الإمام مسلم عن تميم الدارى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

قال الإمام النووى رحمه الله فى شرحه: ثم قال [يعنى الخطابى] وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما رووه، وتقليدهم فى الأحكام، وإحسان الظن بهم.

তামিম দারি থেকে বর্ণিত; হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'ধর্ম হলো কল্যাণ কামনা।'

আমরা আরজ করলাম, 'কার কল্যাণ কামনা?'

তিনি বললেন, 'আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসুলের, মুসলমানদের ইমামগণের এবং সাধারণ মুসলমানদের।'

মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ *নাবাবি*তে এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এই হাদিস 'উলামায়ে দীন'কেও ইমামদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উলামায়ে দীনের কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে তাঁদের বর্ণিত হাদিসসমূহ গ্রহণ করা, শরিয়তবিধিতে তাঁদের তাকলিদ করা এবং তাঁদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করা।[৩২]

তাকলিদে শাখসি

গায়রে মুকাল্লিদিন বা লা-মাজহাবিগণের সামনে তাকলিদের দলিলসমূহ তুলে ধরার পর যখন ফেঁসে যায়, জবাব দিতে পারে না তখন বলে, আমরা তাকলিদে ইজতেমায়ি বা সমষ্টিগত তাকলিদ মানি; কিন্তু তাকলিদে শাখসি বা ব্যক্তি-তাকলিদ মানি না। আবু হানিফা, শাফিয়ি তথা কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে কেন অনুসরণ করতে হবে? চলুন দেখি কুরআন-হাদিসে ব্যক্তি-তাকলিদের কথা কোথায় কীভাবে বলা আছে?

এক.

﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾

---

[৩২] *মুসলিম* : ১/৫৪।

যিনি আমার (আল্লাহর) দিকে রুজু করেছেন তার পদাঙ্ক অনুসরণ করো।
[সুরা লুকমান : ১৫]

জানা গেল আল্লাহর দিকে ধাবিত ব্যক্তিবর্গের তাকলিদ করা আবশ্যক। আরবি গ্রামারকে সামনে রাখলে কথাটি আরও জলদি বুঝে আসে। 'সাবিল' মানে রাস্তা। সাবিলের বহুবচন হলো 'সুবুল', মানে রাস্তাসমূহ। আল্লাহ একবচনে সাবিল বলছেন। অর্থাৎ, ব্যক্তিকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

দুই.

সহিহ বুখারির হাদিস; এক মহিলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে কিছু একটা জিজ্ঞেস করল। হুজুর বললেন, 'পরে এসো।' মহিলা বললেন, 'আমি আবার আসার পর যদি আপনাকে না পাই?' নবি বললেন, 'আবার এসে আমাকে না পেলে আবু বকরের কাছে যেয়ো।'[৩৩]

إن لم تجدينى فأتى أبا بكر.

নবিজি এখানে ব্যক্তি-তাকলিদের কথাই বললেন। বলে দিতে পারতেন, আমাকে না পেলে কুরআন আছে, হাদিস আছে, দেখে নিয়ো। বললেন, আবু বকরের কাছ থেকে মাসআলা জেনে নিয়ো।

عن هزيل بن شرحبيل يقول سئل أبو موسى عن ابنة و ابنة ابن و أخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود، فسيتابعنى، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبى موسى، فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبى صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت، فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال لا تسئلونى مادام هذا الحبر فيكم.

এক লোক তার কন্যা, নাতনী ও বোন রেখে মারা গেছেন। এখন মৃতের রেখে যাওয়া সম্পদ কীভাবে ভাগ হবে? মাসআলার জন্য যাওয়া হলো আবু মুসা আশআরি রা.-এর কাছে। তিনি ফতোয়া দিলেন, 'মেয়ে অর্ধেক, বোন অর্ধেক। নাতনী বঞ্চিত।' মাসআলা দেওয়ার পর সঙ্গে এ কথাও বলে দিলেন যে, 'তোমরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখো। তিনিও এভাবেই বলবেন। যাও, গিয়ে বলো, আমি এভাবে বলে পাঠিয়েছি।'

---

[৩৩] *সহিহ বুখারি* : ৩৬৫৯, ৭২২০, ৭৩৬০; *মুসলিম* : ২৩৮৬।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে গিয়ে বিস্তারিত জানানোর পর তিনি মাসআলা দিলেন এভাবে, মেয়ে অর্ধেক, নাতনী এক ষষ্ঠাংশ এবং বোন অবশিষ্ট। সহজ করে বললে সম্পদ ছয় ভাগ করে মেয়ে ছয়ের তিন, নাতনী ছয়ের এক এবং বোন ছয়ের দুই। ইবনে মাসউদ সিদ্ধান্ত দিলেন আবু মুসা আশআরির উলটা।

লোকগুলো আবার আশাআরির কাছে ফিরে এসে বলল, আমরা ইবনে মাসউদের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি তো এভাবে বললেন। আবু মুসা আশআরি তখন বলেছিলেন, *লা তাসআলুনি মা দামা হাজাল হিবরু ফিকুম।* যতক্ষণ এই ইলমের সাগর তোমাদের মাঝে থাকবেন, আমাকে আর মাসআলা জিজ্ঞেস করো না।[৩৪]

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আবু মুসা আশআরি রা. মাসআলা দিয়ে বলতে পারতেন, যাও, কুরআন-হাদিসের সঙ্গে মিলাও গিয়ে। তিনি পাঠালেন ইবনে মাসউদের কাছে। একজন ব্যক্তির কাছে। আর সেই ব্যক্তির কাছ থেকে নিজের মতামতের বিপরীত ফয়সালা আসার পর তিনিও তার অনুসরণ করে নিলেন।

আরও অনেক হাদিস জখিরায়ে আহাদিসে বিদ্যমান। সারতব্য হলো, তাকলিদ সমষ্টিক হোক, ব্যষ্টিক হোক; দুটোরই বৈধতা দেওয়া আছে কুরআনে কারিমে, হাদিসে নববিতে। তাই মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হলো মুজতাহিদের তাকলিদ তথা অনুসরণের মাধ্যমে আমলি জিন্দেগি পরিচালনা করা। যারা এর ব্যতিক্রম করবে, কুরআন-হাদিসের নাম নিয়ে যতই তারা মায়াকান্না করুক, বুঝতে হবে তাদের মতলব ভালো না।

মুজতাহিদ সাহাবি

সোয়া লাখ সাহাবির মধ্যে সবাই মুজতাহিদ ছিলেন না। হাফিজ ইবনুল কায়্যিম রাহ. জানিয়েছেন, সাহাবিগণের মধ্যে মুজতাহিদ সাহাবি ছিলেন ১৩০ জন। যাদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন,

১. উমর ইবনুল খাত্তাব রা.
২. আলি ইবনে আবু তালিব রা.
৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.
৪. আয়েশা সিদ্দিকা রা.
৫. জায়েদ ইবনে সাবিত রা.
৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.

---

[৩৪] *সহিহ বুখারি :* ৬৭৩৬।

৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.

৮. মাআজ ইবনে জাবাল রা.

৯. আবু মুসা আশআরি রা.

১০. উবাই ইবনে কাআব রা. প্রমুখ।[৩৫]

এই সাহাবিরা ইজতেহাদ করে মাসআলা বলতেন। বাকিরা সবাই তাদের কথায় তাকলিদ করতেন। *তাবরানি শরিফে* (আওসাত)আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদিসটি এ পর্যায়ে সামনে নিয়ে আসা যেতে পারে।[৩৬]

خطب عمر بن الخطاب الناس بالجابية، وقال: يا أيها الناس! من أراد أن يسأل عن القران فليأت أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله جعلني له واليا وقاسما.

সায়্যিদুনা ফারুকে আজম রা. বলেন, তোমরা কেউ যদি কুরআন সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করতে চাও, তাহলে উবাই ইবনে কাবের কাছে যাও। মিরাস বা সম্পদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার হলে জায়েদ বিন সাবিতকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। ফিকাহর কোনো মাসআলা হলে মাআজ ইবনে জাবালের কাছে যাও; আর পয়সা-কড়ির ব্যাপার-সেপার হলে আমার কাছে এসো। কারণ, আমি খলিফাতুল মুসলিমিন। তোমাদের আর্থিক সমস্যার দিক আমারই দেখাশোনা করার কথা।

মোটামুটি এই আলোচনা থেকে প্রমাণ করা গেল শরিয়তে ব্যক্তি-তাকলিদ বা অনুসরণও আছে। এখন প্রশ্ন হলো, আমরা তাহলে মুজতাহিদ সাহাবিদের অনুসরণ না করে পরবর্তী চার ইমামের অনুসরণ কেন করছি?

এই প্রশ্নের জবাব তাকলিদের সংজ্ঞাতেই দেওয়া আছে। সাহাবিদের কাছ থেকে মাসআলা-মাসায়িল লিখিত অবস্থায় আমরা পাইনি।

তাকলিদ কেমন মাসআলায়

আহাফিদের মধ্যে যারা আলিম, যারা 'সাধারণ মুসলমানের সাবজেক্ট নয়' এমন বিষয়াবলিকে মুখ বাঁকিয়ে মাথা দুলিয়ে এবং দুধ-পানি গুলিয়ে প্রচার করে বেড়ান,

---

[৩৫] *ইলামুল মুকিয়িন* : ১/১০।

[৩৬] *হায়াতুস সাহাবা* : ৩/২০১।

যারা মুজতাহিদ ইমামের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং তাকলিদ করাকে শিরকের অন্তর্ভুক্ত ফতোয়া দিয়ে মুসলমানকে বিভ্রান্ত করার অপকর্মে লিপ্ত— এই অধ্যায় তাদের রূহের প্রতি উৎসর্গিত।

ইমাম বা মাজহাব ফলো করার কারণে তারা আমাদেরকে মুশরিক পর্যন্ত বলতে ছাড়েন না; কিন্তু এটা তারা ভুলে যান, উপরের দিকে থুথু ছিটালে সেটা নিজের মুখেই ফিরে আসে। আমরা যদি এক ইমামের তাকলিদ করার কারণে মুশরিক হই, তাহলে অনেকের তাকলিদের কারণে তারা কী হবেন? তাদের সংজ্ঞামতে আমরা যদি মুশরিক হই, তাহলে এক ইমামের তাকলিদের কারণে আমরা ছোট মুশরিক। আর ডজন ডজন ইমামের তাকলিদের কারণে তারা বড় মুশরিক। এখন বড় মুশরিক হয়ে ছোট মুশরিকদের নিয়ে লম্বা লম্বা কথা বলা কি মানায়!

আহকামে শরইয়্যাহ

ইসলামি শরিয়তের মূলনীতির আলোকে আহকামে শরইয়্যাহ বা শরিয়তের নির্দেশাবলি; যেগুলো বান্দার আমলের সঙ্গে সম্পৃক্ত, প্রথমত দুই রকম :

১. আহকামে ওয়াজিহা বা সুস্পষ্ট নির্দেশাবলি।

২. আহকামে গায়রে ওয়াজিহা বা অস্পষ্ট নির্দেশাবলি।

আহকামে ওয়াজিহা মানে আল্লাহ বা রাসুল কী বলছেন, সেটা স্পষ্ট করেই বিবৃত হয়েছে কুরআনে কারিমে অথবা আহাদিসে নববিতে। তেমন মাসআলা-মাসায়িলে কারও তাকলিদ করতে লাগে না। তাকলিদ করতে হয় মাসায়িলে গায়রে ওয়াজিহায়। তাকলিদ করা লাগে সেইসব মাসআলাসমূহে যেগুলোর ভাব অস্পষ্ট।

মাসায়িলে গায়রে ওয়াজিহা পাঁচ প্রকার

১. মাসায়িলে গায়রে মানসুসাহ

২. মাসায়িলে মানসুসাহ মুজতামিলাহ

৩. মাসায়িলে মানসুসাহ মুতাআরিজাহ

৪. মাসায়িলে মানসুসাহ মুহতামিলাতুল মাআনি

৫. মাসায়িলে মানসুসাহ গায়রে মুতাআই-য়্যিনাতুল আহকাম

মাসায়িলে গায়রে মানসুসাহ

মাসায়িলে গায়রে মানসুসাহ হচ্ছে সেসব মাসায়িল, যেগুলোর ব্যাপারে সরাসরি নস বা কুরআন-হাদিস নেই। মুজতাহিদ ইমাম বা ফকিহগণকে সামঞ্জস্যিক আয়াতে কিয়াস করে ইজতেহাদের ভিত্তিতে সেগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে হয়। আর উম্মতের সবাই সেটা মেনে নেয়। আহলে হাদিস নামধারীরা অস্বীকার করলেও তাদেরকেও মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এমন উদাহরণ কুরআনেও আছে, হাদিসেও আছে।

কুরআনে কারিমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন,

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

নিশ্চয়ই মদ-জুয়া, প্রতিমা, ভাগ্য নির্ধারক তিরসমূহ—এগুলো বিষ্ঠা, শয়তানের কাজ, বেঁচে থাকো এগুলো থেকে যাতে কল্যাণপ্রাপ্ত হও। [সুরা মায়িদা : ৯০]

সাধারণত মদ হারাম হওয়ার দলিল হিশেবে উক্ত আয়াত বেশি উপস্থাপিত হয়; অথচ মদের আরবি 'খামর' নয়। আর আয়াতে 'খামর'কে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। 'খামরুন' সেই সকল বস্তুকে বলা হয় যেগুলো সেবন করলে সাময়িক সময়ের জন্য মানুষের বোধশক্তি লোপ পায়। এই আয়াত দ্বারা শরাব বা মদ হারাম হয় কোন ফর্মুলায়? আচ্ছা মদের কথা বাদ। আয়াতে গাঁজা, আফিম, ভাঙ, তাড়ি, চারস, বিয়ার, হুইস্কি, ওয়াইন ইত্যাদি আরও যত মাদকজাত দ্রব্যাদি আছে সেগুলোর তো উল্লেখ নেই। তাহলে পৃথিবীর সকল আলিমগণ যে সেগুলোও হারাম বলে ফতোয়া দেন কীসের ভিত্তিতে দেন?

জবাব হলো, ইজতেহাদ করে কিয়াসের ভিত্তিতে। ইমামগণ যে ব্যাপারটিকে আমলে নিয়েছেন সেটি হলো, মদ হারাম করা হলো কেন? কারণ, এটা মানুষের বোধশক্তি নষ্ট করে ফেলে। এটার ওপর কিয়াস করে মাসআলা বের করেছেন, সেই সকল দ্রব্যাদিও হারামের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো মানুষকে 'টাল' বানিয়ে দিতে পারে।

এই সূত্রটি বুঝলে অতি উৎসাহী যারা জর্দা দেওয়া পান খাওয়াকেও হারামের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলতে চান, তাদের যুক্তির অসারতা প্রমাণিত হয়ে যায়। পানের সঙ্গে জর্দা খেয়ে কেউ কোনোদিন টাল হয়ে গেছে বা আবুল-তাবুল বকেছে, এমন একটি উদাহরণও কি পৃথিবীতে আছে? তাহলে কীসের সঙ্গে কী মেলানো হয়? অবশ্য পান খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না, এভাবে বললে কথাটিকে একটি নেক নসিহত হিশেবে গ্রহণ করার কথা ভাবা যায়।

হাদিস থেকে উদাহরণ

হাদিস শরিফে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه فإن فى أحد جناحيه شفاء وفى الأخر داء.

> খাবারে মাছি পড়ে গেলে সেটাকে খাবারের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। মাছির এক ডানায় বেমার এবং অন্য ডানায় সেই বেমারের ওষুধ রয়েছে।[৩৭]

যেহেতু আমরা জানব না মাছি তার কোন ডানা খাবারে ঢুকিয়েছে, তাই সতর্কতা হিশেবে বিশ্বনবির এই প্রেসক্রিপশন। বেমার এবং প্রতিষেধক বরাবর, ডেবিট-ক্রেডিট সমান।

আচ্ছা খাবারে মশা পড়ে গেল। কী করতে হবে? মশাকেও কি খাবারে ডুবিয়ে দিতে লাগবে? মশার ডানায়ও কি মাছির মতো কেরামতি আছে? মশা-মিশ্রিত খাবার খাওয়া কি জায়েজ? মশা কি হালাল প্রাণী? মশার কথা তো হাদিসে বলা নেই। না এই হাদিসে, না অন্য কোথাও। তাহলে উপায়?

উপায় হচ্ছে, মাছির ওপর কিয়াস করে মশার মাসআলা দিতে হবে। আর এই কাজটিই করে দিয়ে গেছেন ইমামগণ। তাঁরা জীববিজ্ঞানের সূত্র যাচাই করে দেখেছেন, মাছির শরীরে রক্ত থাকলেও সেটা প্রবাহিত রক্ত নয়। মশারও তাই। এরপর মাছির ওপর কিয়াস করে মশার হুকুম বর্ণনা করেছেন। মাছির হুকুম সরাসরি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আর মশার হুকুম ইমামের ইজতেহাদ দ্বারা। মুহতারাম বুজুর্গানে আহলে হাদিস, আপনারাও তো তাই মানেন। তাহলে কেন মিথ্যা করে বলেন, আপনারা মুজতাহিদের ইজতেহাদ মানেন না?

আরেকটি উদাহরণ

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদ হারামজনিত বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন,[৩৮]

> الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد.

স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, খেজুর এবং লবণ; হাদিসে ছয়টি বস্তুর নাম নিয়ে বলা হয়েছে এগুলোর লেনদেনের ক্ষেত্রে সমতা রাখতে হবে। কমবেশি করলে সুদ হয়ে যাবে। তার মানে কি এই ছয় বস্তু ছাড়া আর কিছুতেই সুদ হবে না? টাকার কথা তো বলাই হলো না। তাহলে?

মুজতাহিদগণ ইজতেহাদ করে জানিয়েছেন হাদিসে ছয় বস্তুর উদাহরণ টানা হয়েছে

---

[৩৭] *সহিহ বুখারি* : ৫৭৮২।

[৩৮] *মুসলিম* : ১৫৮৯।

সমসাময়িক যুগের ওপর ভিত্তি করে; কিন্তু হাদিসে শব্দ খাস হলেও উদ্দেশ্য আম। যেকোনো বস্তু—একই বস্তু যদি আদান-প্রদান হয়, সমান সমান হতে হবে। যত দেওয়া হবে ঠিক ততই ফেরত নিতে হবে। এক ফোটা বাড়িয়ে নিলে সেটাই হবে সুদ।

মাসায়িলে মানসুসাহ মুজতামিলাহ

মাসায়িলে মানসুসাহ মুজতামিলাহ সেই সকল হুকুমকে বলা হয়, যেগুলোর ব্যাপারে সরাসরি নস বা কুরআন-হাদিস যদিও আছে; কিন্তু হুকুমে ইজমাল রয়ে গেছে। তাফসিল বা ব্যাখ্যা নেই। যেমন, সুরা মায়িদার ছয় আয়াত নম্বর আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾

হে ইমানদারগণ, নামাজের জন্য মুখ ধোও। আয়াতে মুখের সীমানা বলে দেওয়া হয়নি। না কুরআনে, না হাদিসে। মুজতাহিদ ইমামগণ সীমানা বের করে দিয়েছেন। কপালের উপরাংশের চুলের গোড়া থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত, এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত ধুতে হবে। এখানে ইজতেহাদ করা ছাড়া উপায় ছিল না।

তিরমিজি শরিফে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস,

> إذا ركع أحدكم فقال فى ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال فى سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده، وذلك ادناه .
>
> নবিজি বলেছেন, রুকুতে যেয়ে কমপক্ষে তিনবার *সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম* পড়বে। সিজদায় যেয়ে *সুবহানা রাব্বিয়াল আলা* কমপক্ষে তিনবার পড়বে। তবেই রুকু-সিজদা কামিল হবে।[৩৯]

এখন প্রশ্ন হলো কেউ যদি দুইবার পড়ে? একবার পড়ে; অথবা যদি একবারও না পড়ে, তাহলে তার নামাজের কী অবস্থা? ফকিহ ইজতেহাদ করে উম্মতকে জানালেন, সওয়াবে ঘাটতিসহ তাঁর নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ, নামাজে রুকু-সিজদা করা ফরজ আর তাসবিহ পড়া সুন্নাত।

মাসায়িলে মানসুসাহ মুতাআরিজাহ

কুরআন-হাদিসে মাসআলা তো আছে; কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী আয়াত

---

[৩৯] *তিরমিজি* : ২৬০।

বিদ্যমান। তেমন মাসআলাকে মাসায়িলে মানসুসাহ মুতাআরিযাহ বলা হয়। যেমন, সুরা বাকারার ২৩৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا﴾

এই আয়াতে জানানো হলো, মহিলার স্বামী মারা গেলে ইদ্দত ৪ মাস ১০ দিন।

আবার একই সুরার একটু পরে গিয়ে ২৪০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

﴿وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ﴾

এখানে আবার বলা হচ্ছে ইদ্দত একবছর! একই ব্যাপারে এক আয়াতে ৪ মাস ১০ দিন অন্য আয়াতে একবছরের কথা! এখন মুসলমান কোন আয়াতের ওপর আমল করবে? লা-মাজহাবি বলবেন, এটা আর এমন কী! কোন আয়াত নাসিখ কোনটা মানসুখ, কোনটা রাজেহ কোনটা মারজুহ দেখলেই তো হয়! অথবা কোন আয়াত আগের আর কোন আয়াত পরের, পরের আয়াত যেটা সেটাকে আমলে নিয়ে নিলেই হলো।

জি জনাব-মণ্ডলী, এই কাজটাই তো করে গেছেন আবু হানিফা। রাতের পর রাত আরামের ঘুম হারাম করে সাহাবিগণকে জিজ্ঞেস করে ইমাম সাহেব নিশ্চিত হয়েছেন, কোন আয়াত আগে নাজিল হয়েছিল আর কোন আয়াত পরে! সেই আলোকে ইমাম আমাদের জানিয়েছেন, ইদ্দত পালিত হবে ৪ মাস ১০দিন। এটাই ফুল এন্ড ফাইনাল। কারণ, চার মাস ১০ দিনের আয়াত পরে নাজিল হয়েছিল। তাহলে কোন বিবেকে আবু হানিফার সমালোচনা করেন? কোন লজ্জায় বলেন 'আমরা তাকলিদ করি না'? তাকলিদ কি ঢাকডোল পিটিয়ে করার জিনিস নাকি?

হাদিস থেকে উদাহরণ

أخرج الإمام الترمذى رحمه الله عن وائل بن حجر قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قرأ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآ لِّيْنَ ، وقال أمين، ومد بها صوته.

ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলছেন, আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآ لِّيْنَ পড়ার পর টেনে 'আ-মিন' পড়তে শুনেছি।[৪০]

আবার একই হাদিসগ্রন্থের একই পৃষ্ঠায় একই সাহাবি থেকে ঠিক পরের হাদিসটি হচ্ছে—

[৪০] *তিরমিজি* : ২৪৮।

وأخرج عنه أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ فقال أمين، وخفض بها صوته.

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাইরিল غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ পড়ার পর অনুচ্চস্বরে 'আ-মিন' পড়লেন।

এখন উপায়? কোনটি আমলে নেওয়া হবে?

ইমাম আবু হানিফা রাহ. দ্বিতীয় হাদিসকেই আমলে নিলেন। অনেকগুলো কারণের মধ্যে (বিস্তারিত 'আমিন' অধ্যায়ে আলোচনা হবে) এটিও একটি কারণ যে, একই বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী হাদিস থাকলে মুহাদ্দিসগণের একটা স্বভাব হলো, যে হাদিসটি পরের সেটাকেই পরে বর্ণনায় আনেন।

মাসায়িলে মানসুসাহ মুহতামিলাতুল মাআনি

সেই সকল মাসায়িল, যেগুলোর ব্যাপারে আয়াত বা হাদিসে উল্লিখিত শব্দের অর্থে এহতেমাল রয়ে গেছে। অর্থাৎ, একাধিক বা পরস্পর-বিরোধী অর্থের প্রকাশ করছে শব্দটি। যেমন, সুরা বাকারার ২২৮ নম্বর আয়াতটি পড়ুন—

﴿وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ﴾

তালাকপ্রাপ্তা নারী তাকে অপেক্ষায় রাখবে তিন 'কুরু'। হোয়াট ইজ দ্যা কুরু? আরবি ব্যাকরণ বলছে 'কুরু' মানে হায়েজ, কুরু মানে তুহুর। অর্থাৎ, মহিলাদের ঋতুকালীন সময়কে কুরু বলা হয়। আবার পবিত্র থাকার সময়কেও কুরু বলা হয়। এখন এই মাসআলার সমাধান কী?

আবু হানিফা ইজতেহাদ করে জানালেন, কুরু মানে ঋতুকালীন সময়কেই আমি প্রাধান্য দিচ্ছি। (প্রাধান্যের যৌক্তিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন, সেটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক)। সেই আলোকে আয়াতে বিবৃত 'সালাসাতা কুরু' মানে হবে তিন হায়েজকালীন সময়। অন্যদিকে ইমাম শাফিয়ি 'সালাসাতা কুরু' মানে তিন তুহুর বা পবিত্র অবস্থার সময়কে গ্রহণ করেছেন। দুজনেই সঠিক। কারণ, কুরু শব্দটি উভয় অর্থই বহন করে।

মাসায়িলে মানসুসাহ গায়র মুতাআইয়্যিনাতুল আহকাম

তেমন মাসায়িল যেগুলোয় হুকুম নির্দিষ্ট নয়। অর্থাৎ, নসসে কুরআনের প্রায়োগিক হুকুম অস্পষ্ট। যেমন, সুরা নাহলের ৯৮ নম্বর আয়াত—

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾

কুরআন তিলাওয়াত শুরু করার আগে *আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম* পড়তে হবে। এটা পড়া ওয়াজিব।

অন্যদিকে সুরা মায়িদার ২ নম্বর আয়াত—

﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾

হজের কার্যক্রম শেষে শিকার করো; কিন্তু এখানে শিকার করা ওয়াজিব নয়।

'ফাসতাইজ' এবং 'ফাসতাদু' দুটোই আমর বা আদেশসূচক শব্দ; কিন্তু *আল আমরু লিল উজুব* মূলনীতি উভয় আয়াতেই ফিট করা যাচ্ছে না। ফকিহগণের সিদ্ধান্ত হচ্ছে শিকার করা মুস্তাহাব; আর এটা সাব্যস্ত হয়েছে ইজতেহাদের মাধ্যমে—যেহেতু মাসআলাটি গায়রে মুতাআইয়িনাতুল আহকামের অন্তর্ভুক্ত।

উপরে যে মাসআলাগুলোর শরয়ি ক্যাটাগরি বলা হলো, সেগুলো এবং এ ধরণের অন্যান্য মাসআলার সমাধান ইমামের ইজতেহাদ ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। এখন যারা বলতে চান কুরআন-হাদিস থাকতে ইজতেহাদের দরকার কী? হয় তারা নাবালেগ চিন্তা-ভাবনা লালন করছেন; আর নাহয় ধান্ধায় আন্ধা হয়ে আছেন। আল্লাহপাক তাদেরকে শিফায়ে কামিলা আজিলা দান করুন। আমিন।

প্রাসঙ্গিক একটি কথা দিয়ে এই পার্ট শেষ করি

কপালে তিলক ব্যবহার করা জায়েজ কি জায়েজ না এ ব্যাপারে কুরআন-হাদিসে কিছুই বলা নেই; কিন্তু সকল উলামা-ফুকাহা এ ব্যাপারে একমত যে, মুসলমান মেয়েরা তিলক পরতে পারবে না। দলিল কী?

দলিল হলো কিয়াস।

কোন হাদিসের আলোকে?

عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم.

যে যে জাতির কালচার গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।[৪১]

যেহেতু কপালে তিলক পরা একটি বিশেষ ধর্মের ধর্মীয় রেওয়াজ, তাই এটি মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। কিয়াস-ইজতেহাদ-তাকলিদ যারা মানেন না, জিজ্ঞেস করি তারা কি তাদের স্ত্রী-কন্যাদের কপালে তিলক পরাতে রাজি হবেন?

---

[৪১] *মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা* : ১৯৭৪৯।

তাকলিদ নিয়ে অভিযোগ

চারটি অভিযোগ বেশ প্রচারিত।

এক.

সুরা মায়িদার ৩ নম্বর আয়াত—

﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا﴾

আয়াতটি সামনে এনে তারা বলার চেষ্টা করেন, আল্লাহ বলছেন—আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। আর তোমরা বলো আবু হানিফা এসে অনেক মাসআলা বের করে দিয়েছেন। তাহলে কি দীন পুরা হয় নেই তখন? আল্লাহর আয়াত কি তবে মিথ্যা? যদি মিথ্যা না হয় তাহলে আবার তাকলিদের প্রশ্ন আসে কেন? আবু হানিফাকে মানতে হয় কেন?

আমরা বলি, তুমি তো আয়াতের মর্মই বুঝোনি। আল্লাহ বলেছেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। এর কারণে তার পরের সকল মাসাআলা-মাসায়িল যদি এই আয়াতের বিপরীত হয়ে বিদআত হয়ে যায়, তাহলে এই আয়াতের পরে যে আরও আয়াত নাজিল হলো, সেগুলোর ব্যাপারে কী বলবে? কুরআনে কারিমের সর্বশেষ নাজিলকৃত আয়াত।[৪২]

﴿وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ﴾

এই আয়াতও কি তাহলে বিদআত?

তারা তখন কথার মোড় ঘুরিয়ে নেয়। বলে, আয়াতে 'আল ইয়াউম' মানে সুনির্দিষ্ট সেই দিন উদ্দেশ্য নয়, নবির যুগ বোঝানো হয়েছে। আমরা বলি 'আকমালতু' মানেও সব মাসআলা উদ্দেশ্য নয়, তখনকার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় মাসআলা এবং পরের সর্বযুগের জন্য মাসাআলা বের করার উসুলের কথা বলা হয়েছে। ওটা বুঝো আর এটা বুঝো না?

---

[৪২] সুরা বাকারা : ২৮১।

দুই.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾

মুশরিকদের যখন বলা হতো অনুসরণ করো আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানের, তারা বলত আমরা বরং আমাদের বাপ-দাদার রীতি-রেওয়াজের ওপরই আমল করব। [সুরা বাকারা : ১৭০]

কুরআন-হাদিস রেখে বাপ-দাদা তথা মুরুব্বিদের, তথা ইমামের অনুসরণ করা তো অন্যায়। তাহলে আবু হানিফার রীতি-রেওয়াজের অনুসরণ করা কেন অন্যায় হবে না?

জবাব আর আমাদের দিতে হবে না। জবাব স্বয়ং আল্লাহই দিয়ে ফেলেছেন। তোমাদের উত্থাপিত অভিযোগের আয়াতের শেষ অংশেই আল্লাহ বলে দিয়েছেন—

﴿أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

বস্তুত তাদের বাপ-দাদা ছিল বেকুব এবং ভ্রষ্ট। বেকুবদের অনুসরণ করতে হয় না। আর যে আবু হানিফা কুরআন-হাদিস ঘেঁটে উম্মতকে ৮৩ হাজার মাসআলা বের করে দিয়ে গেছেন, সেই আবু হানিফাকে যদি বেকুব ক্যাটাগরিতে ফেলার বেকুবি করো, তাহলে উম্মতে মুহাম্মাদি একটি মাসআলায় মোটামুটি ইজমা করে ফেলবে। আর সেটা হলো, তোমাদেরকে ভালো কোনো গ্যারেজে ঢুকিয়ে মাথার স্ক্রুগুলো টাইট দিয়ে আনানো। ইমাম আবু হানিফাকে সবাই অনুসরণ না করতে পারে; কিন্তু আবু হানিফার মতো একজন ফকিহকে কেউ বোকা বা বেকুব ভাবলে তাকে স্ক্রু ঢিলা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে রাজি হবে না।

তিন.

তোমাদেরকে যখন প্রশ্ন করা হয় তোমাদের মাজহাব কী? তোমরা বলো আমরা হানাফি। হানাফি না বলে মুহাম্মাদি বলো না কেন? তোমরা কি নবির মাজহাবকে আপন করে নিতে পছন্দ কর না? তাদের ধারণা মতো এটি তাদের বেশ বুদ্ধিদীপ্ত একটি প্রশ্ন।

আমরা বলি, একটা হলো পথ আর একটা হলো উদ্দেশ্য বা গন্তব্য। আবু হানিফা আমাদের পথ আর নবি আমাদের গন্তব্য, নবি আমাদের মনজিল। নবিকে আমরা ভালোবাসি বলেই তাঁকে পথে নামিয়ে আনি না। তোমরা তো মনজিলকে রাস্তা বানিয়ে নবিকে অপমান করছ।

চার.

ইমাম আবু হানিফার কথা তাঁর ছাত্র আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদরাই তো মানেননি। তাহলে তোমরা মানছ কেন?

আমরা তাদের বলি, আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করেছেন। সুলায়মান আ.-এর যুগে তোমরা জন্মাওনি। তাহলে নির্ঘাত মুরতাদ হয়ে যেতে। তোমরা যখন দেখতে সুলায়মান আ. তাঁর পিতা দাউদ আ.-এর ইজতেহাদি মাসআলার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন, যে ঘটনার বিবরণ দেওয়া আছে কুরআনে কারিমের সুরা আম্বিয়ার ৭৮/৭৯ নম্বর আয়াতে—

﴿وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ○ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ﴾

এক লোক ফসল ফলিয়েছিল। পাশের বাড়ির অন্য আরেকজন ছাগল পালন করত। দিনের বেলা সে তার ছাগলকে নিজ তদারকিতে ঘাস খাওয়াতো আর রাতে ছাগলঘরের দরজায় তালা দিয়ে রাখত, যাতে বেরিয়ে গিয়ে আরেকজনের ফসলের বারোটা না বাজিয়ে ফেলে।

একদিন দরজায় তালা দিতে ভুলে গেল সে। ছাগল বেরিয়ে ফসলের সাড়ে বারোটা বাজিয়ে দিয়ে এলো! বিচার গেল আল্লাহর নবি দাউদ আ.-এর কাছে। তিনি বললেন, এখানে ছাগলের মালিকের খামখেয়ালি আছে। অতএব, ক্ষতিপূরণ হিশেবে সে তার ছাগল ফসলের মালিককে দিয়ে দেবে।

দাউদ আ.-এর আদালত থেকে বেরিয়ে তাদের দেখা হলো দাউদ-তনয় সুলায়মান আ.-এর সঙ্গে। তিনি দুজনের বক্তব্য শুনে বললেন, এসো আমার সঙ্গে। আবার নিয়ে গেলেন দাউদ আ.-এর কাছে। বললেন, এই মামলায় এরচেয়ে ভালো একটা সমাধানের উপায় আমার জানা আছে। ছাগলের মালিক তার ছাগল ফসলের মালিকের হাওলা করে দেবে, আর জমি নিয়ে আসবে তার কব্জায়। ছাগল যে পরিমাণ ফসল নষ্ট করেছে, সে পরিমাণ ফসল ফলাতে যেটুকুন সময় এবং শ্রম দিতে হয়, তা দিয়ে ফসল ফলিয়ে দেবে ছাগলের মালিক। আর এই সময় জমির মালিক ছাগলের দুধ দোহন করে পান করবে। যেদিন ফসল আগের অবস্থায় চলে আসবে, ছাগলের মালিক ছাগল ফেরত পাবে। আর সুলায়মান আলাইহি সালামের সিদ্ধান্ত আল্লাহরও পছন্দ হলো। আল্লাহ জানালেন—

﴿فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ﴾

আমিই সুলায়মানকে সঠিক সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। [সুরা আম্বিয়া : ৭৯]

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, ইজতেহাদি মাসআলায় ছেলে সুলায়মান আ. বাবা দাউদ আ.-এর ফয়সালার বিপরীত ফয়সালা দিলেন।

দাউদ আ.-কে তোমরা এই বলে অমান্য করতে যে, তিনি কেমন নবি, যাকে তাঁর ছেলেই মানল না; আর মুসলমান হয়ে নবিকে অমান্য করলে মুরতাদ হওয়া ছাড়া উপায় থাকত না।

তরকে তাকলিদের পরিণাম

তাকলিদ না করলে দুনিয়া-আখেরাতে মুশকিলে পড়তে হয়। বিগত আলোচনা থেকেই ব্যাপারটি মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা। পরের অধ্যায়গুলোতেও এ ব্যাপারে বিক্ষিপ্তভাবে কথা আসবে। এখানে আলাদা করে কয়েকটি কথা জানাই।

তাকলিদ না করলে পরিণাম কী হয় দেখার আগে আরেকবার দেখে নিই পন্ডিতের দল যে বলে 'আমরা তাকলিদ করি না'—এই কথাটি সত্যি কি না! আসলেই তারা তাকলিদ করে কি না?

সুরা ফাতিহা নিয়েই কথা বলি। এই সুরা পাবলিকের হাতের নাগালে থাকায় বুঝতে সুবিধা। সুরা ফাতিহার প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দ 'আল-হামদু'। এখন আমি পড়লাম 'উলহামদু', তারা বলবে ভুল। আপনি পড়ুন 'ইলহামদু', তারা বলবে ভুল। এবার তর্ক হোক।

জিজ্ঞেস করি—

উলহামদু/ইলহামদু বললে ভুল হবে কেন?

কুরআন খুলে দেখাবে আলহামদুর হামজার উপর জবর দেওয়া।

—আচ্ছা, এই জবর কি আল্লাহ দিয়েছেন?

বলবে, না।

—মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ দিয়েছেন?

—না।

—তাহলে কে দিলো?

—হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।

—উনি কি কোনো নবি ছিলেন?

—না,

—তবে মনে হয় কোনো পীরে কামিল হবেন?

—আরে নাহ। হাজ্জাজ ছিল একজন জালিম শাসক। আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরসহ অনেক সাহাবিকে হত্যা করেছে সে।

—তাই যদি হয় তাহলে তুমি এমন লোকের তাকলিদ করছ কেন?

—কোথায় করলাম?

—তার দেওয়া 'জের, জবর, পেশ'-কে আমলে নিয়ে সেভাবেই কুরআন পড়ছ!

ফা বুহিতাল্লাজি কাফার! মুখ বন্ধ হয়ে গেল তখন!

এর মানে সুরা ফাতিহার আলহামদুলিল্লাহর 'হামজা'ই তাকলিদ ছাড়া প্রমাণ হয় না! আরেকবার মনে করিয়ে দিই—কারও কথাকে বিনাবাক্যে মেনে নেওয়ার নামই তাকলিদ। বড় আজিব এক জাতি হলো এই আহাফি বা লা-মাজহাবিরা। উপায় যখন থাকে না হাজ্জাজের মতো ফাসিকেরও তাকলিদ করে; আবার ঘাড়ে যখন খান্নাস সওয়ার হয় আবু হানিফার মতো ইমামকেও অস্বীকার করে বসে। আর বসে বসে উলটা-পালটা প্রশ্ন খুঁজে বের করতে থাকে :

- সাহাবিরা কি মাজহাব মানতেন?
- আবু হানিফা কোন মাজহাবের অনুসারী ছিলেন?
- তারা চারজনকে ইমাম কে নিযুক্ত করল?
- আচ্ছা ইমাম চারজনই কেন? আর কি কোনো যোগ্য ফকিহ ছিলেন না?

আল্লাহই জানেন এদের পূর্ব-পুরুষের কোনো ধারা বনি ইসরাইলের সঙ্গে যুক্ত ছিল কি না! সম্ভাবনা আছে। আলামত তো তাই বলে।

আলিফ থেকে ইয়া সমাচার

আলহামদুর প্রথম হরফ হামজা নাকি আলিফ—তা নিয়েও কথা হয়। কেউ বলেন আলিফ জবর-আ, কেউ বলেন হামজা জবর-আ। অবশ্য ইলমে তাজবিদের নিয়ম অনুযায়ী আলিফ ততক্ষণই আলিফ, যতক্ষণ সেটা খালি থাকে। খালি মানে খ আ-কার খা, ল হ্রস্ব ই-কার লি=খালি। যখনই আলিফের সঙ্গে জের-জবর-পেশ-তাশদিদ-জযম কিছু একটা যুক্ত হয়ে যায়, তখন আলিফ আর আলিফ থাকে না। আলিফের নাম হয়ে যায় হামজা।

যাই হোক, হামজা হোক আর আলিফই হোক, এটার নাম যে আলিফ আমরা জানলাম

কীভাবে? আলিফ থেকে ইয়া, আরবি ২৯টি হরফের যে উচ্চারণ, আলিফ-বা-তা-সা, এগুলোর উচ্চারণ যে আলিফ বা তা সা-ই—দলিল কী? এই একটি প্রশ্নই যদি তাদেরকে করা হয়, তাদের চৌদ্দ দু'গুনে আটাশগোষ্ঠী মিলেও দলিল দিয়ে প্রমাণ করতে পারবে না এগুলোর নাম যে আলিফ-বা-তা-সা। একমাত্র তাকলিদের মাধ্যমেই আরবি হরফগুলোর উচ্চারণ আমরা পেয়েছি। তারা যদি তাদের দাবির সঙ্গে বেইমানি না করে দাবিতে শক্ত থাকে, তাহলে প্রমাণ করুক এগুলো কুরআন-হাদিসের কোন দলিল দ্বারা প্রমাণিত!

পরিণাম

তাকলিদ না করলে এখানেও সমস্যা, ওখানেও সমস্যা। যেমন দেখুন—

মা অসুস্থ। অপারেশন করতে হবে। ডাক্তার জানিয়েছেন তিন ব্যাগ রক্ত লাগবে, ও পজিটিভ। বেচারা লা-মাজহাবি গায়রে মুকাল্লিদ, তাকলিদ করেন না। গেলেন তাঁর শায়খের কাছে। (যদিও শায়খের কাছে যাওয়া এবং শায়খের কথা মানাটাও তাকলিদ!) গিয়ে বললেন, হুজরত, আমার মা খুব অসুস্থ। রক্ত দিতে হবে। কী করব? রক্ত দেওয়া কি জায়েজ হবে?

শায়খ জানাবেন, 'নারে বাবা, রক্ত দিতে পারবা না। কুরআন-হাদিসে রক্ত দেওয়ার কথা নেই।' (এটা বলতেই হবে, যদি দাবি অনুযায়ী তাকলিদ না করার পক্ষে অনড় থাকেন)।

—কিন্তু হুজুর, রক্ত দেওয়া ছাড়া তো মাকে বাঁচানো যাবে না!

—বাবারে! মা বড় না ইমান বড়? মাকে বাঁচাতে গিয়ে কি ইমান নষ্ট করে ফেলবা? হায়াত-মউত সব আল্লাহর হাতে। আল্লাহ হায়াত বাকি রাখলে রক্ত ছাড়াই তোমার মা বাঁচবে। চিন্তা করো না। আল্লাহ আল্লাহ করো।

এখন হয় তাকে মা বাঁচাতে হবে, আর না হয় ইমান। মা আর ইমান দুটো বাঁচানোর উপায় নেই; কিন্তু আফটার অল মা তো। বেচারা চলে আসলো মাজহাবের ইমামের অনুসারী কোনো আলিমের কাছে। তিনি তাকে বললেন, জলদি যা বেটা, যেখান থেকে পারিস রক্ত জোগাড় করে মাকে বাঁচা। এমন পরিস্থিতিতে রক্ত দেওয়া শুধু জায়েজই নয়; বরং এটি এখন তোর জন্য জরুরি।

সে আবার ফিরে গেল তার শায়খের কাছে। গিয়ে বলল, শায়খ, অমুক আলিম তো বললেন, মাকে নাকি রক্ত দেওয়া যাবে! শায়খ শব্দ করে বলে উঠলেন, আস্তাগফিরুল্লাহ! শেষ পর্যন্ত তুই মাকে বাঁচানোর অজুহাতে শিরকে লিপ্ত হয়ে যাবি?

—এভাবে কেন বলছেন শায়খ?

-তুই জানিস না রক্ত দেওয়ার ব্যাপারে কুরআন-হাদিস নীরব। ওই আলিম তো তাদের আবু হানিফার ইজতেহাদ করা মাসআলার ভিত্তিতে রক্ত দেওয়া জায়েজ বলেছে। এখন তুই যদি এটা গ্রহণ করিস, তাহলে তাকলিদ করার কারণে শিরকে লিপ্ত হয়ে গেলি!

বেচারা আবার দৌড়ালো মাজহাবি আলিমের দিকে। তিনি তাকে বুঝিয়ে বলে দিলেন, ইন-জেনারেল রক্ত দেওয়া-নেওয়া হারাম ঠিকাছে; কিন্তু আমাদের ইমাম ইজতেহাদ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, রক্ত দেওয়া হারামের কারণ হলো মানুষের শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা। তার মানে মানুষের সুস্থতার দিকটাই হারামের ইল্লত বা কারণ। সুতরাং মানুষের শারীরিক সংকট সৃষ্টির আশঙ্কায় যেহেতু রক্ত দেওয়া হারাম, একই কারণে একজন মানুষকে বাঁচানোর স্বার্থে রক্ত দেওয়া জায়েজ; বরং সওয়াবের কাজ। তুমি নিঃসন্দেহে তোমার মাকে রক্ত দাও। মা বাঁচাও, ইমানও বাঁচবে। নো টেনশন।

তাকলিদ না করলে এভাবেই মা-বাবাদের মৃত্যুর দিকে চলে যেতে দেখলেও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না।

কবরে সাইজিং

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত[৪৩]—

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع فى قبره، وتولى، وذهب أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان، فاقعده، فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، قال النبى الله عليه وسلم، فيراهما جميعا، واما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدرى، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين.

মৃতকে কবরে রেখে সাথিরা যখন চলে যায়, তখন মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার আওয়াজ শুনেন। এর মধ্যে দুই ফেরেশতা চলে আসেন। তাকে বসিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, 'এই ব্যক্তি সম্বন্ধে তুমি কী বলতে'?

বান্দা যদি নেককার হয় তাহলে বলে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। তখন ফেরেশতাদ্বয় তাকে প্রজ্জ্বলিত জাহান্নাম দেখিয়ে বলেন, 'এটা তোমার

---

[৪৩] *সহিহ বুখারি* : ১৩৩৮, ১৩৭৪; *মুসলিম* : ২৮৭০।

বাসস্থান হতো, এর পরিবর্তে আল্লাহপাক তোমাকে জান্নাত দিচ্ছেন।' আর কাফির ও মুনাফিকদের বেলায় ঘটে ঠিক তার বিপরীত ঘটনা। তারা নবিকে চিনতে পারে না! তখন ফেরেশতাদ্বয় বলেন, *লা দারাইতা ওয়ালা তালাইতা*। তুই দলিলের মাধ্যমে জানতি না, আবার তাকলিদ করে মানতিও না। তাহলে...

হাদিসে বর্ণিত لا دريت ولا تليت মানে কী?

মানে হচ্ছে, তুই মুজতাহিদও ছিলি না আবার তাকলিদও করতি না। কীভাবে করলাম এই তরজমা?

'লা তালাইতা' মানে তুই তিলাওয়াত করতি না। অর্থাৎ, কুরআনে কারিমের মাধ্যমে আল্লাহ কী নির্দেশ দিচ্ছেন, সেটা পড়েও দেখতি না! আর নিজে নিজে পড়ে বোঝার এবং আমল করার যোগ্যতা থাকলে তাকে মুজতাহিদ বলা হয়।

'লা দারাইতা' মানে, তুই জানতিও না। জানার জন্য জাননেওয়ালার কাছে যেতে হয়। তার কথা মানতে হয়। মানার নাম তাকলিদ। বাংলায় অনুসরণ।

শেষ বিচারের শেষে

'তোমাদের এই দশা হলো কেন? তোমাদের কাছে কি আল্লাহর পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী কেউ যায়নি?' জাহান্নামবাসীদের যখন এই প্রশ্ন করা হবে তারা বলবে, 'এসছিল, আমরা পাত্তা দিইনি—

﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾

> ইস! আমরা যদি তাদের কথা শুনতাম, বুঝতাম, তাহলে আজ জাহান্নামবাসী হতাম না। [সুরা মুলক : ১০]

শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবির ব্যাখ্যামতে, 'নাসমাউ' হচ্ছে তাহকিক এবং 'নাকিলু' মানে তাকলিদ। অর্থাৎ, তারা বলবে, আমরা তাহকিকও করতাম না তাকলিদও করতাম না। আল্লাহর বিধিবিধান যারা আমাদের সামনে ব্যাখ্যা করতেন, আমরা সেগুলোয় কান দিতাম না। আবার নিজেদের আক্কেল-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে মুজতাহিদের কাছে জিজ্ঞেস করে আমলেও নিতাম না তাদের কথা।[৪৪]

তাকলিদের অপরিহার্যতা

সুরা ফাতিহাকে বলা হয় সমস্ত কুরআনের খোলাসা বা সারাংশ। কী আছে সুরা

[৪৪] *তাফসিরে আজিজি* : ৩/২৯।

ফাতিহায়, বুঝলে সমস্ত কুরআন বোঝা সহজ হয়ে যাবে। আর এর মধ্যদিয়ে এটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে, তাকলিদ করতেই হবে কেন।

কুরআনে কারিমে মৌলিকভাবে ছয়টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। সেগুলো হলো তাওহিদ, রিসালাত, আখেরাত, আহকাম, ইমান ও কুফর। আর সুরা ফাতিহার মধ্যে ছয়টি বিষয়ই আছে।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন এবং আর-রাহমানির রাহিম-এর মধ্যে তাওহিদ বিবৃত হয়েছে। মা-লিকি ইয়াউমিদ্দিন-এর মধ্যে আখেরাত, ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তায়িন-এর মধ্যে আহকামাত, সিরাতাল্লাজিনা আন-আমতা আলাইহিম-এর মধ্যে রিসালাত ও ইমান এবং গাইরিল غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآ لِّيْنَ-এর মধ্যে কুফর।

আরও সংক্ষিপ্ত করে বলা যাক। কুরআনে কারিমের মৌলিক বিষয় দুটি :

১. আকাইদ

২. মাসায়িল

আকাইদের মধ্যে মৌলিক আকিদা হলো তাওহিদ। আর মাসায়িলের মধ্যে মৌলিক মাসআলা হলো তাকলিদ। চলুন দেখি সুরা ফাতিহায় তাওহিদ আর তাকলিদ কীভাবে বর্ণিত হলো।

সুরা ফাতিহার প্রথম চার আয়াত, আলহামদুলিল্লাহ থেকে শুরু করে ইয়্যাকা নাসতায়িন পর্যন্ত আছে তাওহিদ। আর ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম থেকে শেষ পর্যন্ত আছে তাকলিদ এবং তাকলিদ অস্বীকারকারীদের থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা।

﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ 'প্রশংসামাত্রই আল্লাহর, যিনি সারা জগতের প্রতিপালক।' আল্লাহর প্রশংসা তাওহিদের একটি অংশ। একত্ববাদে বিশ্বাসী না হলে প্রশংসা করার প্রশ্ন আসত না।

﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ 'পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।' প্রশংসা, তাওহিদ।

﴿مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ 'আল্লাহর ক্ষমতার স্বীকারোক্তি।' পার্ট অব তাওহিদ।

﴿اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾ 'একমাত্র আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাইবার ওয়াদা কেউ তখনই করবে, যখন একত্ববাদে আস্থা রাখবে। বোঝা গেল, প্রথম চার আয়াতে তাওহিদই বিবৃত হয়েছে। এবার দেখব পরের আয়াতগুলোতে তাকলিদের কথা কীভাবে বলা হলো।

﴿اِهْدِ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴾ 'আমাকে সঠিক পথ দেখাও আল্লাহ।' সঠিক পথ কোনটি?

পরের আয়াত—

﴿صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ 'আল্লাহ আমাকে সেই পথ দেখাও, যে পথে তোমার কাছ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্তরা পরিচালিত ছিলেন।' আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত কারা ছিলেন, সেটার পরিচয় দেওয়া হয়েছে সুরা নিসার ৬৯ নম্বর আয়াতে—

﴿الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ﴾

চার তবকার কথা বলা হয়েছে। নবিগণ, সাহাবিগণ, শহিদগণ এবং সুলাহা বা আল্লাহর নেক বান্দাগণ।

তার মানে আমরা আল্লাহর শিখিয়ে দেওয়া মতে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, আল্লাহ আমরা তোমার কাছ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত নেক বান্দাদের পথে চলতে পারার তাওফিক চাচ্ছি। যে পথ শুরু হয়েছে পৃথিবীতে, শেষ হয়েছে গিয়ে জান্নাতে।

তাকলিদ বা অনুসরণের সবক দেওয়া হলো এখানে। আল্লাহপাক বলে দিতে পারতেন 'সিরাতাল কুরআন' অথবা 'সিরাতাস-সুন্নাহ'। এভাবে না বলে উলামা, শুহাদা-সাহাবা এবং নবিগণের অনুসরণের কথা বলে দিয়ে লা-মাজহাবিদের অপপ্রচারের জন্মের আগেই আমাদের জন্য জবাব রেডি করে দিয়ে রাখলেন। সেই সঙ্গে গায়রে মুকাল্লিদিন থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাঁর কাছে সাহায্য চাইবার শিক্ষাটাও দিলেন। শেষ আয়াত—

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ﴾ 'হে আল্লাহ, যাদের প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট আর যারা পথভ্রষ্ট, তাদের রাস্তা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রেখো।'

আল্লাহ কাদের ওপর অসন্তুষ্ট? কারা পথভ্রষ্ট?

একদম সোজা হিসাব। দুই আর দুই যোগ করে চার মেলানোর মতো। যারা আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট। তাদের পথই সঠিক পথ। সুতরাং যারা এদের তাকলিদ বা অনুসরণ করবে, তারাই থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টির তালিকায়। আর যারা এদের অনুসরণ করবে না, তারাই হবে মাগজুব আলাইহিম, তারাই হবে জোয়াল্লিন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, যারা নিজেদের 'গায়রে মুকাল্লিদ' বলে দাবি করেন, তারাও কিন্তু নিজেরদের অজান্তে আল্লাহর কাছে গায়রে মুকাল্লিদিন হওয়া থেকে পানাহ চান! একবার দুইবার না, প্রতিদিন ৫ বেলা নামাজে অন্তত ৩২ বার 'সিরাতাল্লাজিনা আন-আমতা আলাইহিম-এর মাধ্যমে তাঁরা আল্লাহর কাছে দুআ করেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে তাকলিদ করার তাওফিক দাও।' তাঁরা এত করে বলেন, তবুও তাঁদের এই দুআ কবুল হয় না কেন? কেন তাঁরা তাকলিদ করতে পারছেন না?

জবাব হলো দুটি : একটি ইতিবাচক, দ্বিতীয়টি একটু নেতিবাচক।

ইতিবাচক জবাব হলো, তাদের দুআ ঠিকই কবুল হচ্ছে। তারাও তাকলিদ করছেন। শুধু মুখ দিয়ে তাকলিদ করার কথাটি স্বীকার করছেন না। এই আর কি!

নেতিবাচক জবাব হলো, আল্লাহপাক বলেছেন,

﴿إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

> নামাজ নামাজিকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। [সুরা আনকাবুত : ৪৫]

তাকলিদ না মানা মানে সুরা ফাতিহার অর্ধেক না মানা। কত জঘন্য খারাপ কাজ এটা; অথচ তাদেরকে তাদের নামাজও এই খারাপ কাজ থেকে রক্ষা করতে পারছে না। এর কারণ :

- হতে পারে তারা শান্ত ও সোজা হয়ে ভদ্রভাবে নামাজে দাঁড়ায় না বলে!
- হতে পারে তারা রাসুলের প্রথম দিককার কিছু হাদিস পেয়ে চিল্লায়া 'আমিন' বলে দেখে!
- হতে পারে তারা নবিজির শেষ আমলকে আমলে নিয়ে রাফে-ইয়াদাইন ছাড়া নামাজ পড়ে না বলে! এগুলো ত্যাগ করলে হয়তো তাদের নামাজ, তাদের সিরাতাল্লাজিনা আন-আমতা আলাইহিম-ওয়ালা তাকলিদের দুআটি আল্লাহপাক কবুল করে নিতেন।

টীকা

আলহামদুলিল্লাহ এর অর্থ সবাই করেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমি লিখলাম প্রশংসামাত্রই আল্লাহর। এভাবে কেন বললাম?

কারণ, 'সকল' শব্দটি সর্বাংশে হলেও শতভাগ নয়। সব বোঝালেও সবের ভেতরে থাকা ছোটখাটো কিছু বাইরে থেকেই যায়। উদাহরণ দিলে কথাটি বুঝতে সহজ হবে।

উদাহরণ এক

কোনো ফ্যামিলিকে কেউ বিয়ের দাওয়াত দিলো। বলল, আপনাদের পরিবারের সকলের দাওয়াত, সবাই আসবেন। সবাই গেল বিয়েতে; কিন্তু ঘর খালি রেখে যাওয়া তো ঠিক না। তাই কাজের মেয়েকে বাড়িতে রেখে বাবা-মা, ভাই-বোন, ভাবি, ছেলেমেয়ে সবাই গিয়ে উঠলেন বিয়েবাড়িতে। তারা জিজ্ঞেস করল, 'সবাইকে নিয়ে এসেছেন তো'?

বলবে, 'হ্যাঁ। আমরা সবাই চলে এসেছি'। বিয়েবাড়ির মানুষও জানে তাদের ঘরে একটা কাজের মেয়ে আছে, যে আসেনি। তবু এরাও বলে সবাই এসেছি, তারাও বুঝে নেয় সবাই এসেছে।

উদাহরণ দুই

প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ। কোনো এলাকায় মন্ত্রী মহোদয় এসেছেন। ফরমান জারি হয়েছে এই এলাকার একমাত্র স্কুলটির সকল ছাত্রছাত্রী স্কুল থেকে বেরিয়ে রাস্তার দুই ধারে দাঁড়াবে। হতে পারে ক্লাস টু'র দুই তিনটি ছেলে স্কুল মাঠেই খেলা করতে থেকে গেছে। তবুও বলা হবে স্কুলের সবাই এসেছে। তাদের কথাটিকেও মিথ্যে মনে করা হবে না, যদিও আক্ষরিক অর্থে কথাটি সত্যি না।

অর্থাৎ, 'সকল' বলার পরও কখনো কখনো কিছু বাকি থেকে যাবার আশঙ্কা থেকে যায়। যদি বলা হয়, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তাহলে ওই কাজের মেয়ের মতো, ওই বাচ্চাদের মতো কিছু প্রশংসা অন্য কারও জন্যও বাকি থেকে যাবার সম্ভাবনা থাকে; অথচ বাস্তবতা হচ্ছে জগতে যত প্রশংসা হতে পারে, সেগুলোর একমাত্র হকদার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। এ জন্যে সকল প্রশংসা আল্লাহর না বলে বলা দরকার প্রশংসামাত্রই আল্লাহর।

মাজহাব মানে কি অন্ধবিশ্বাস

ইমাম বলেছেন বলেই চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে হবে? আল্লাহপাক আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন। সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে দেখা দরকার না ইমামের কথা ঠিক আছে কি না? কুরআন-হাদিসভিত্তিক কি না? আর এটা তো খোদ আবু হানিফাই বলে গেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার কোনো কথা যদি হাদিসের খেলাফ পাওয়া যায়, তাহলে আমার মতামতকে ত্যাগ করে হাদিসেই আমল করো'... এটা হচ্ছে লা-মাজহাবি পণ্ডিতদের (কু) যুক্তি।

কথাটি ইমাম আবু হানিফা কোন কিতাবের কত নম্বর লাইনে কীভাবে বলেছেন, এই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েই বলি, চোখ-কান বন্ধ করার দরকার নেই। যাচাই করাই যায়। তবে আগে তো ঠিক করতে হবে যাচাই করবেটা কে? অজ্ঞ না বিজ্ঞ? বিজ্ঞতার মাপকাঠিই-বা কী?

করুণা হয় কিছু লোকের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিত্ব দেখে। তারা খুব সহজেই বুঝে ফেলেন, ডাক্তারি বই পড়ে পড়ে ডাক্তার হওয়া যায় না। ডাক্তার হতে হলে অভিজ্ঞ ডাক্তারের ছাত্র হতে হয়। তাদের কাছে ক্লাস করতে হয়, ডাক্তারের সঙ্গে প্র্যাকটিক্যালে অংশ নিয়ে বছরের পর বছর ডাক্তারের পেছনে পেছনে ঘুরতে হয়। অথচ সেই তারাই এমন ভাব নেন যে, নিজে নিজে অধ্যয়ন করে অথবা বাংলা-ইংলিশ মিলিয়ে কয়েক ডজন বই পড়ে কুরআন-হাদিসে পণ্ডিত হয়ে গেছেন! তাদের আচরণে বোঝা যায়, কুরআনে কারিম যেন ডাক্তারি বই থেকেও সোজা একটি গ্রন্থ!

বাকি থাকল ইমামের কথা, তাঁর মতামত হাদিসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। সহিহ হাদিসের বিপরীত হলে মতামতকে ছুঁড়ে ফেলে হাদিসে আমল করা!

এক লোক গেছে ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে—ওষুধ লিখে দিলেন। নিজস্ব ফার্মেসি থেকে ওষুধও দিলেন। প্রতিটি ট্যাবলেটের মূল্য ১০০ টাকা। লোকটি বলল,

—বলেন কী স্যার! সামান্য একটি ট্যাবলেটের দাম ১০০ টাকা হবে কেন?

—ডাক্তার বললেন, এটা অনেক ভালো ওষুধ, উন্নত ব্র্যান্ড। এটার বাজারমূল্য ১০০ টাকাই।

—তবুও...

—আচ্ছা বাবা বাইরে গিয়ে যাচাই করে দেখিস। যদি আমার ওষুধ দুই নম্বর হয়, তাহলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসে পয়সা ফেরত নিয়ে যাস। লোকটি বেরিয়ে গেল; আবার কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে বলল,

—ডাক্তার সাব, আমার পয়সা ফেরত দিন।

—কেন?

—আপনার ওষুধ দুই নম্বর ছিল।

—কে বলেছে?

—আমি যাচাই করেছি। আপনিই তো বলেছিলেন যাচাই করতে।

—তুমি কার কাছে যাচাই করালে?

—অই তো! মোড়ের দোকানটার সামনে এক লোক বসে সবজি বিক্রি করে না? তার কাছে। সে ভালোভাবে পরীক্ষা-টরিক্ষা করে আমাকে জানিয়েছে এটা অনেক জঘন্য একটা ওষুধ! এটা খাওয়া মোটেও ঠিক হবে না!

ডাক্তারের মেজাজ খারাপ না হয়ে উপায় ছিল না। বললেন, 'ও পণ্ডিত! ওষুধের গুণগত মান যাচাই করবার জন্য তোমার উচিত ছিল, ভালো আরেকজন ডাক্তারের কাছে যাওয়া। সবজিওয়ালা ওষুধের গুণাগুণ কী বুঝবে'?

লোকটি তখন মিন মিন করে বলল, তাহলে তো আপনার আগেই বলে দেওয়া উচিত ছিল কার কাছে যাচাই করতে হবে।

ডাক্তার বললেন, তোমারও আগে আমাকে জানানো উচিত ছিল তোমার মাথার ঘিলুর যে এই দুরবস্থা।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর মাসআলাকে যাচাই করতে বলেছেন—শুনেই সবজি মার্কেটের দিকে দৌড় দিলে তো হবে না। আলু-পটল বিক্রেতারা মাসআলা যাচাই তো পরে, বাছাইটা-ই তো করতে পারবে না। কোনো কথা পেলেই বুঝে না বুঝে লাফালাফি...!

আবু হানিফা যদি বলেও থাকেন, সেটা কি রজাক আলি, মতি মিয়া আর গজনফর শেখদের বলেছেন? এই সামান্য আক্কেল-জ্ঞানটুকু তো থাকা দরকার ছিল। আবু

হানিফার এই কথা তো ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়িদের মতো মুজতাহিদদের জন্য। যাচাই তো করবেন ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারিদের মতো মুহাদ্দিস। ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিজির মতো শায়খগণ। না বুঝে লাফালাফি শুরু করে দেওয়া তো বুদ্ধিমানের কাজ না।

মাজহাব মানতে হবে কেন

'সাহাবিগণ মাজহাব মানতেন নাকি? তাদের জন্য মাজহাব তৈরি করা বা মানা বাধ্যতামূলক না হলে আমাদের জন্য কেন হবে?'

তারা যখন এভাবে বলে, সহজ-সরল মুসলমান বিভ্রান্ত না হয়ে পারে না। ভাবে, কথা তো ঠিক, সাহাবিগণের জন্য মাজহাব-টাজহাব না লাগলে আমাদের জন্য লাগবে কেন? সূত্রটা আবার মনে রাখি। কারও যদি সরাসরি কুরআন-হাদিস থেকে আমল করার যোগ্যতা থাকে, তাহলে তার জন্য মাজহাব মানার দরকার নেই। তবে এ জন্য কুরআন (৩০ পারা) এবং হাদিস (সবগুলো) জানা থাকা লাগবে। না জানলে মানবেটা কী?

দীনি কোনো বিষয় সামনে এলো। মতি মিয়া বলল, 'আমি মাজহাব মানি না। কুরআন-হাদিসে যেমন আছে, তেমনই আমল করব।'

আচ্ছা বাবা কর; কিন্তু কীভাবে করবি? দুই/চার শ' হাদিস ঘাটাঘাটি করে সিদ্ধান্তে চলে আসলে তো হবে না। হতে পারে তোর ধরা-ছোঁয়ার বাইরের হাদিসগুলোয় এর বিপরীত কথাই আছে; আর সেটাই বেশি নির্ভরযোগ্য।

মাজহাব না মেনে নিজে নিজে আমল করার জন্য তো ৩০ পারা কুরআন এবং ১০ লক্ষাধিক হাদিস মুখস্থ না থাকলেও পড়া থাকতে হবে, অন্তত নলেজে থাকা লাগবে। বর্তমান বিশ্বে এমন একজন মুহাদ্দিসের খবরও কি কেউ দিতে পারবে, যার ১ লাখ হাদিস মুখস্থ আছে; অথচ এক ইমাম বুখারির মুখস্থ ছিল ৪ লাখ হাদিস। আহলে হাদিস পণ্ডিতদের কার কয় গণ্ডা হাদিস মুখস্থ আছে! তাহলে কোন সাহসে বলা হয়, 'নিজে নিজেই হাদিসে আমল করে ফেলব।'

সাহাবিরা কোন মাজহাব মানতেন

এই প্রশ্নের উৎসই হলো মূর্খতা। যারা এমন প্রশ্ন ওঠায়, প্রশ্নটি উঠিয়ে প্রমাণ করে দেয় তারা যে মাজহাবের মানেই বুঝে না। মাজহাব অর্থ হলো মত, পথ, বিশ্বাস, তরিকা, পন্থা, পদ্ধতি এবং ইত্যাদি। সাহাবিগণের মধ্যে অনেক মাজহাব ছিল। দেখা গেছে কোনো ব্যাপারে দুজন মুজতাহিদ সাহাবি দুই মত দিয়েছেন। বাকিরা সবাই দুই ভাগ হয়ে

কেউ গ্রহণ করছেন ইনার তো কেউ উনার। উদাহরণ দিই।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাতে আরশে আজিমে আল্লাহর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন—সবাই একমত। আল্লাহর সঙ্গে দেখা হয়েছে—সবাই একমত; কিন্তু স্বীয় চর্মচোখে আল্লাহকে দেখেছিলেন কি না-সে ব্যাপারে আল্লাহও কিছু বলেননি আর নবিজিও স্পষ্ট করেননি। যে কারণে সাহাবিদের মধ্যে এ বিষয়ে দুই মাজহাব হয়ে গেল।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর মাজহাব হলো, নবিজি সরাসরি আল্লাহকে দেখেছেন; অন্যদিকে আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহার মাজহাব, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ চোখে আল্লাহকে দেখেননি। সাহাবিদের কেউ কেউ আয়েশার মাজহাব মেনে নিলেন; আবার কেউ কেউ ইবনে আব্বাসের।

এখন যেহেতু একজনের বক্তব্য অন্যজনের ঠিক উলটা, তাই দুজনের মাজহাবই সঠিক হতে পারে না; কিন্তু দুজনেরটাই সঠিক ছিল। যে সাহাবিরা ইবনে আব্বাসের মাজহাব গ্রহণ করেছেন তারাও সঠিক, যাঁরা আয়েশার মাজহাব গ্রহণ করেছেন তারাও সঠিক। কারণ, ইজতেহাদি মাসআলায় মুজতাহিদ যে সিদ্ধান্তই দেবেন (ভুল হোক/শুদ্ধ হোক), মেনে নিয়ে সেভাবে আমল করলেই সওয়াব।

এমন অসংখ্য উদাহরণ ছড়িয়ে আছে হাদিসের কিতাবাদিতে। এরপরেও যদি বলা হয় 'সাহাবিরা কোন মাজহাব মানতেন', তাদের জন্য আমাদের বিনীত পরামর্শ হবে, আবার যান, শুরু থেকে শুরু করেন। আর এটা করতে না চাইলে ভালো একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের হাওলা হন।

চার ইমামের ইখতিলাফ, কে ভুল কে শুদ্ধ

চারজনই শুদ্ধ। এটা কীভাবে হয়? একই মাসআলা চারজন যদি চারভাবে রায় দেন, নিশ্চিত করেই তাদের মধ্যে একজন ঠিক হবেন, তিনজন ভুল।

এই প্রশ্নের জবাবে একটু উপর দিক থেকে দিলে বলা যায়, মুসা আ. ও হারুন আ.-এর মাঝেও ইখতিলাফ হয়েছিল; অথচ দুজনেই সঠিক ছিলেন। দাউদ আ. ও সুলায়মান আ.-এর মধ্যেও ইখতিলাফ হয়েছিল; কিন্তু দুজনেই সহিহ ছিলেন। ইখতিলাফ হলেই জরুরি না যে, দুজনের একজনকে সঠিক আর অন্যজনকে ভুল হতে হবে; কিন্তু হাদিসের ইবারতই পড়তে না-জানা নামধারী আহলে হাদিস ফিরকাকে এত উপরের উদাহরণ দিয়ে লাভ নেই। তাদেরকে তাদের নাগালের মধ্যের উদাহরণ দেওয়া ভালো।

চারজন লোক সফরে গেছে মরু অঞ্চলের কোথাও। সন্ধ্যা শেষে রাতের মধ্যভাগ শেষ হয়ে আসছে। আকাশে মেঘের আনাগোনা। হাতে ঘড়ি নেই, পকেটে কম্পাস নেই,

মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক নেই। নির্জন এলাকা। এশার নামাজের ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে; তারা ঠাহর করতে পারছে না কিবলা কোন দিকে? এই অবস্থায় তাদের কী করণীয়?

শরিয়তের বিধান হলো, তারা তখন 'তাহাররি' করবে। তাহাররি মানে নিজের বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আন্দাজ করবে কিবলা কোন দিকে হতে পারে। তারপর তাঁর কাছে যে দিককে কিবলা মনে হবে, সে দিকেই নামাজ পড়ে নেবে।

উল্লেখিত চারজন তাহাররি করে চারজনের কাছে চারদিক কিবলা মনে হলো। তখন তাঁরা যার যার তাহাররি অনুযায়ী নামাজ আদায় করবে এবং চারজনের নামাজই শুদ্ধ হবে; অথচ এখানে চারজনের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই তিনজনের কিবলা ভুল ছিল।

রমজান মাসে এমন কোথাও গিয়ে আটকা পড়েছেন, ইফতারের টাইম হয়েছে কি না বুঝতে পারছেন না। বোঝার কোনো উপায়ও নেই। সারাদিন থেকেই সূর্যেরও দেখা মেলেনি। তখন আপনি কী করবেন?

তাহাররি করবেন। আপনি যখন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, সূর্য অস্ত গেছে, তখন ইফতার করে নেবেন। বাস্তবে যদি তখনো সূর্য অস্ত না-ও যেয়ে থাকে, তবুও আপনার রোজা শুদ্ধ হয়ে যাবে।

উপরের এই সহজ উদাহরণগুলো যদি মাথায় ঢুকাতো, তাহলে চার ইমামের ইখতিলাফের প্রেক্ষিতে কে শুদ্ধ আর কে ভুল—এই প্রশ্ন আর ওঠাত না।

চার ইমামে ইখতিলাফ কেন

কারণ, ইখতিলাফটা সাহাবিদের যুগে ছিল। উৎপত্তিটা সেখান থেকেই। আর ইজতেহাদি মাসআলায় ইখতিলাফ হতেই পারে। কারণ, আল্লাহপাক সকলকে মেধা ও জ্ঞান সমান দেননি। সাহাবিগণও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়তেন। *সহিহ বুখারির* হাদিস[৪৫]—

عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: ليصلن أحد العصر إلا فى بنى قريضة، فأدرك بعضهم العصر فى الطريق، فقال بعضهم: لا نصلى حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلى، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف واحدا منهم.

[৪৫] *সহিহ বুখারি* : ৯৪৬, ৪১১৯।

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের একটি দলকে বনু কুরায়জায় পাঠাচ্ছিলেন। তাদেরকে বলে দিলেন, জলদি যাও। ওখানে পৌঁছে আসরের নামাজ পড়বে। তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তায় দেরি হলো। মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে আসছে। সাথিদের মধ্যে শুরু হলো ইখতিলাফ। কেউ বলেন নামাজ আদায় করে নিই, কেউ বলেন রাসুল ওখানে গিয়ে পড়ার কথা বলেছেন।

কেউ বলেন, রাসুলের উদ্দেশ্য তো ছিল আমরা যাতে তাড়াতাড়ি পৌঁছি, আসরের ওয়াক্ত থাকতে থাকতেই। তাই নামাজ কাজা না করে পড়ে ফেলা উচিত। কেউ বলেন, না, রাসুল আমাদেরকে ওখানে গিয়ে আসর পড়তে বলেছেন, নামাজ কাজা হলে হোক, আমরা সেখানে গিয়েই পড়ব।

সাহাবিরা পরিষ্কার দুই ভাগ হয়ে গেলেন। কিছু সাহাবি রাস্তায় আসরের নামাজ আদায় করে নিলেন। বাকিরা ওখানে গিয়ে কাজা আদায় করলেন। ফিরে আসার পর ব্যাপারটি যখন হুজুরের সামনে পেশ করা হলো, হুজুর কাউকেই দোষারোপ করলেন না। উভয়েই সঠিক ছিলেন।

আরও অনেক মাসআলাতেই সাহাবিদের মধ্যে ইখতিলাফ ছিল। হজরত সালমান ফারসির মাজহাব ছিল আগুন দিয়ে রান্না করা কোনো খাদ্য গ্রহণ করলে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে; কিন্তু বাকি সাহাবিদের কারও এই মাজহাব ছিল না। কারও কারও মাজহাবমতে, পুরুষ তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু নষ্ট হবে, কারও কারও মাজহাবমতে অজু নষ্ট হবে না। এমন আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। মোদ্দাকথা, চার ইমামের ইখতিলাফের কারণ সাহাবিদের মধ্যকার ইখতিলাফ।

একাধিক মাজহাব মানলে সমস্যা কী

এমন কিছু পণ্ডিতও আজকাল ডানে-বামে পাওয়া যায় যারা বলে, আচ্ছা বুঝলাম মাজহাব মানতে হবে। মানলাম না-হয়; কিন্তু 'এক মাজহাব' মানতে হবে কেন? যে মাসআলায় যে ইমামের হাদিস বেশি সহিহ মনে হবে, সেই মাসআলায় সেই ইমামের কথা মানলাম। তাহলে তো তাকলিদও করা হলো; আর সহিহ হাদিসও মানা হলো। অসুবিধাটা কী?

আমরা তাকে বলি, তেমন কোনো অসুবিধা নেই। তবে রোগী মারা যাবার আশঙ্কা আছে! রোগী কেমনে মারা যাবে, বলছি। তার আগে কিছু প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাওয়া দরকার।

কিছু পণ্ডিতকে বলতে শোনা যায়, আবু হানিফা, মালিক, শাফিয়ি এবং আহমদ ইবনে হাম্বল—এ ছাড়া আর কোনো ফকিহ নেই? আর কোনো মুজতাহিদ ছিলেন না? তাহলে

শুধুই চারজনের অনুসরণ কেন? ইমাম সুফিয়ান সাওরি, আওজায়ি, হাসান বসরি, ইবনে আবি লায়লা—তাঁরা কি মাজহাবের ইমাম হতে পারার যোগ্যতায় চার ইমাম থেকে খুব বেশি পিছিয়ে ছিলেন? তারাও কি উম্মতকে অনেক মাসআলা দিয়ে যাননি? তাহলে তাদের তাকলিদ নয় কেন? তাদেরকে ইমাম ঘোষণা দিয়ে তাদের মাজহাব ফলো করলে সমস্যা কোথায়?

জবাবে একদম সংক্ষেপ কথায় বলা যায়, চার মাজহাবের চার ইমাম থেকে শরিয়তের যাবতীয় ব্যাপারে নিয়মতান্ত্রিকভাবে মাসআলা লিখে দেওয়া আছে। আমাদের ইমাম ইমামে আজম আবু হানিফাই ৮৩ হাজার মাসআলা বের করে দিয়ে গেছেন। তোমরা যাদের নাম নিলে অথবা অন্য কেউ, তাদের কারও একজনের কাছ থেকে সকল মাসআলা নিয়মতান্ত্রিকভাবে লিপিবদ্ধ থাকাটা বের করে দেখাও। আমরা তোমাদের পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে ভাবব।

মূল প্রশ্ন ছিল, চার মাজহাবের কোনো একজনকে ফলো না করে যে মাসআলায় যে ইমামের হাদিস বেশি সহিহ মনে হবে, সেই মাসআলায় সেই ইমামের কথা মানলে সমস্যা কোথায়?

এ ক্ষেত্রে সমস্যা হলো, সুবিধামতো চারজনকে ফলো করতে চাইলে নফসের গোলাম হয়ে যাওয়া হবে। মহিলার হাতের সঙ্গে যদি হাত লেগে যায়, এমনকি তাওয়াফের সময়ও, ইমাম শাফিয়ির মাজহাবমতে অজু নষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন অজু নষ্ট হবে না। এখন কেউ আছে হারাম শরিফের আঙিনায়। ভিড়ের কারণে কোনো মহিলার সঙ্গে তার হাত লেগে গেছে। সে শাফিয়ি মাজহাবের অনুসারী ছিল। এখন তাকে অজু করতে হবে। তখনকার অবস্থায় সে ভাববে, এই ভিড়ের মাঝে অজু করতে যাওয়া তো বিরাট ঝামেলা। তারচেয়ে বরং এখন আবু হানিফার মাজহাব ফলো করে ফেলি। তাহলে আর অজু করতে হলো না।

হালকা-পাতলা কোনো আঘাতে রক্ত বের হলো। ইমাম শাফিয়ির মাজহাব অনুযায়ী অজু নষ্ট হবে না, ইমাম আবু হানিফার মাজহাবমতে অজু নষ্ট হবে। এই অবস্থায় ওই লোক আবার অজু থেকে বাঁচবার জন্য শাফিয়ি মাজহাবে চলে যাবে। আর এভাবে করতে থাকলে, শরিয়ত আর শরিয়ত থাকবে না, শরিয়তের আর অনুসরণ করা হবে না, শরিয়তকেই বানিয়ে ফেলা হবে নিজের নফসের তাবেদার।

রোগীর কথা বলি

এক লোক অসুস্থ হয়েছে। গেছে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা-

নিরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশন দিলেন। সে প্রেসক্রিপশন সাইট পকেটে রেখে আরেক ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে হাজির হলো। ওই ডাক্তার আবার আরেকটা প্রেসক্রিপশন দিলেন। সে গেল আরেক ডাক্তারের কাছে। তৃতীয় আরেকটি প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করল। বাড়ির কাছে আরেক ডাক্তার ছিলেন। তাঁকেও বঞ্চিত করল না! এবারে সে চার ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন থেকে তার ভালোলাগা ওষুধের নামগুলো আলাদা করে ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে এনে খাওয়া শুরু করল। কী মনে করেন? অবস্থা কী হবে?

যারা চার মাজহাবকে গুলিয়ে ফেলে ইচ্ছামতো পছন্দের মাসআলায় আমল করতে চায়, তার অবস্থা যে ওই রোগীর মতো হবে—এটা কি বোঝা যাচ্ছে? আর যদি চার এম.বি.বি.এস ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন থেকে ওষুধ বাছাই করার ক্ষমতা কারও থাকতে হয়, তাকে তো এফ.আর.সি.এস/ এফ.সি.পি.এস হতে হবে। আবু হানিফা-শাফিয়িদের প্রেসক্রিপশন বাছাই করতে হলে তো তাদের থেকে বড় মুজতাহিদ হতে হবে।

পঞ্চম মাজহাব

এটা আবার কোন মাজহাবরে বাবা। এতদিন শুনে আসলাম মাজহাব চারটি। পঞ্চম মাজহাব আবার কোত্থেকে বেরোলো?

এই পাঁচ-নম্বরি গ্রুপের কাহিনি বলার আগে আরেকবার মনে করিয়ে দিই, মাজহাব অর্থ হলো মত, পথ, বিশ্বাস, তরিকা, পন্থা, পদ্ধতি ইত্যাদি। আর আমাদের বোঝার ভাষায় মাজহাব মানে হচ্ছে, কোনো মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণের মাধ্যমে কুরআন-হাদিস এবং আসারে সাহাবায় আমল করার মাধ্যমে রাসুলের অনুসরণ করা এবং নবসৃষ্ট বিষয়াদি, যেগুলোর ব্যাপারে সরাসরি কুরআন-হাদিসে ফয়সালা পাওয়া যাবে না, সেগুলোয় মুজতাহিদ ইমামের দেওয়া সিদ্ধান্তের আলোকে আমল করা। আরও সহজ ভাষায়, মুজতাহিদ ইমামের বাতলে দেওয়া পথে কুরআন-হাদিসের ওপর আমল করার নাম মাজহাব ফলো করা।

যাদের দাবি তারা কোনো মাজহাব ফলো করেন না, তারা কুরআন-হাদিসে আমল করেন কী করে?

হয়তো কারও না-কারও কিতাব পড়ে তাঁর সিদ্ধান্তের আলোকে!

হয়তো কারও না কারও বয়ান শুনে সেই বয়ানের আলোকে!

হয়তো তারা মানছেন বিন বাজকে,

হয়তো ইবনে তাইমিয়াকে,

হয়তোবা আলবানিকে,

অথবা কোনো ইন্টারনেট শায়খকে।

(অবশ্য মাঝে মধ্যে তারা ইমাম বুখারিকেও টেনে আনবার চেষ্টা করেন। তারা যখন বুখারির উসতাজের উসতাজ ইমাম আবু হানিফাকে পাশ কাটিয়ে বুখারির কথা বলেন, তখন সেটা ভূতের মুখে রাম নামের মতোই শোনায়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত কথা হবে আবু হানিফা ও বুখারি অধ্যায়ে।)

মুখে তারা যাই বলুন, কারও কোনো ব্যাখ্যায় না গিয়ে নিজে নিজে আমল করতে পারার তো প্রশ্নই আসে না। তাহলে অবস্থা দাঁড়ালো এই, আমরা যারা হানাফি মাজহাবের অনুসারী, তারা একজন ইমামের—ইমামে আজম আবু হানিফার অনুসরণ করি; আর লা-মাজহাবিত্বের দাবিদাররা একই সাথে অনেককে অনুসরণ করেন। সেই অনেকের মাঝে আবার, (বুঝে হোক আর না বোঝে, স্বীকার করে হোক আর না করে) ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফিয়ি ও আহমদ সাহেবও আছেন। কারণ, প্রায় সকল মাসআলাতেই তারা যে মতামত আমলে নিয়ে থাকেন, সেটা চার ইমামের কারও না কারও মাজহাব।

তার মানে তারা কারও মাজহাব অনুসরণ না করার দাবি করলেও মূলত তারা একই সাথে অনেকের মাজহাব ফলো করছেন। এর অর্থ তারা নিজেরা নিজেদের মতো করে আরেকটা মাজহাব তৈরি করে নিয়েছেন। শুধু ঠিক করতে পারছেন না—তাদের নতুন মাজহাবের ইমাম পদে কাকে নিয়োগ দেবেন। নাসির উদ্দিন আলবানি সাহেবের প্রতি তাদের একটা ঝোঁক থাকলেও আরও অনেকেই হকদার থাকায় তারা পড়েছেন বিপাকে।

তারা যদি এই সত্যটুকু স্বীকার করতেন যে, 'আমরা কোনো একজনের না, অনেকের অনুসরণ করি', তাহলে অন্তত সত্যবাদি হিশেবে অভিনন্দিত হতে পারতেন। বাদবাকি তারা তাদের ইমামগণের নাম নেবেন কি না সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার ছিল। এ নিয়ে আমাদের বলার কিছু থাকত না। আগেই বলেছি, আমরা আমাদের ইমাম, আমাদের বাবার নাম মুখে নিতে লজ্জা পাই না। ভাগিনা-বউগণ যদি মামা শ্বশুরের নাম মুখে না নেন, না নিতেই পারেন। লজ্জা নারীর ভূষণ! থাকা ভালো।

আশাকরি পরিষ্কার করা গেল পঞ্চম মাজহাব কাকে বলে; আর সেটা কোন মাজহাব? আর অল্প কিছু মুজাদ্দিদ, মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছাড়া তামাম বিশ্বের উলামা-ফুকাহা-সুলাহাগণ চার মাজহাবের ব্যাপারে ইজমাবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরও যারা লা-মাজহাবের নামে পঞ্চম মাজহাবের আবিষ্কার করছেন, তাদেরকে মনে হয় এই হাদিসটি স্মরণ করিয়ে দেওয়াই যায়—

عن أبى بكرة قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولاتكن خامسة، فتهلك، أخرجه الطبرانى فى الثلاثة والبزار، ورجاله موثوقون.

আলিম হও অথবা ইলম অর্জনকারী ছাত্র হও; অথবা আলিমদের সাহায্যকারী হও; অথবা আলিমদের মহব্বতকারী, (কিন্তু খবরদার) পঞ্চম দলভুক্ত হয়ো না। তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।[৪৬]

[৪৬] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৪৯৫।

নেকাবের পেছনের চেহারা

আগেই জেনেছি তাকলিদ মানে দীনি মাসআলা-মাসায়িলের ক্ষেত্রে কাউকে অনুসরণ করা। এই অনুসরণ হতে পারে এককেন্দ্রিক, হতে পারে বহুধা-বিভক্ত। যা হোক, তাকলিদ তো তাকলিদই। আমরা যারা ইমাম আবু হানিফার তাকলিদ করি, আমরা ছোটবেলাতে দেখতাম, সৌদি আরব থেকে ধরা খেয়ে দেশে চলে আসা কেউ কেউ বুকের উপর হাত বেঁধে নামাজে দাঁড়াচ্ছেন। আমরা বুঝে ফেলতাম উনি অন্য মাজহাবে চলে গেছেন। কারণ, বুকে হাত বাঁধার নিয়মও কোনো কোনো মাজহাবে আছে।

আরেকটু বড় হলাম যখন, তখন হঠাৎ-সটাত কোনো কোনো আলিমকে দেখতাম বুকের উপর হাত বাঁধছেন। কিছুটা খালাম্মা খালাম্মা লাগলেও তাঁদের প্রতি আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধায় কখনো কমতি হতো না। এর কারণ, তাঁরাও তাঁদের ব্যক্তিগত পছন্দকে জনসমক্ষে এখনকার মতো প্রচার করে বেড়াতেন না। আবু হানিফা বা মাজহাব নিয়ে বকওয়াস করতেন না। সবাই যার যার জায়গায় ঠিকঠাক চলছিলাম। যার ক্ষেত তার ধান, সমস্যা হচ্ছিল না।

সাধারণ মুসলমান বিব্রত হবেন ভেবে বিগত কয়েক বছর যাবত বিবেক-বিকৃত আত্মবিক্রিত কিছু লোক ইমাম আবু হানিফা এবং হানাফি মাজহাবের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অরুচিকর ভাষায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বানোয়াট এবং জাল-জালিয়াতিমূলক অপপ্রচার করে বেড়ালেও হানাফি আলিমগণ সেগুলোকে এড়িয়ে গেছেন। ভেবেছেন, থাক, বলছে বলুক। এদের জবাব দিয়ে জল আর ঘোলা করে লাভ নেই; কিন্তু সাম্প্রতিককালে তাদের এই অপপ্রচার এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, এ নিয়ে কথা না বললে সাধারণ মুসলমানের ইমান রক্ষা করাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তাই আলিমগণ বিকৃতভাবে উপস্থাপিত তাদের দলিল এবং ইচ্ছামতো করে বেড়ানো অপব্যাখ্যার জবাব দিচ্ছেন। দালিলিকভাবে খুলে দিচ্ছেন তাদের মুখোশ। শুধু চেহারা ঘুরে রাখা নেকাবটা এখনো খোলা হয়নি। যে কারণে ধারণা করা গেলেও এখনো পরিষ্কার বলা যাচ্ছে না, কোন কোম্পানির মাল! তবে খুব তাড়াতাড়ি সেটাও জানা যাবে—ইনশাআল্লাহ।

হালালজাদা হারামজাদা

ভূমিকাতেই বলেছি, আমি বাংলাজগতের মানুষ। আমার পাঠক বাংলা ভাষাভাষী সাধারণ মুসলমান। আর সাধারণ মুসলমানের জন্য দরকার রোগের ওষুধ আর খাওয়ার নিয়মটা বলে দেওয়া। ওষুধের উৎপাদন, উপকরণ, সাইন্টিফিক গ্রহণযোগ্যতা এবং গুণগত মানের বিবরণ তাদের সামনে কচলা-কচলি করে কোনো লাভ নেই।

যারা বলেন তাকলিদ করেন না, তারাও যে মূলত একাধিক ব্যক্তিবর্গের তাকলিদ

করেন, ইতিমধ্যেই সেটা পরিষ্কার করা হয়েছে। আমরা আমাদের ইমামকে আমাদের বাবার আসনে স্থান দিই। তাই কেউ যদি আমার বাবাকে নিয়ে নোংরা কথা বলে, আমরা বসে থাকতে পারি না। বাবাকে গালিগালাজ করলে কোনো হালালজাদাই নীরব থাকতে পারে না, হারামজাদাদের কথা আলাদা।

হাতি ঘুমিয়ে ছিল। বয়স হয়েছে। আগের মতো দৌড়ঝাপ করে না। পেলে খায়, না পেলে সবর করে শুয়ে থাকে।

একদিন শুয়ে ছিল গাছের ছায়ায়। পড়ে ছিল মরার মতো। কোত্থেকে জানি একটি শিয়াল এসে দেখল হাতি মরে পড়ে আছে! শিউর হওয়ার জন্য প্রথমে দূর থেকে ঢিল ছুঁড়ল একটা।

হাতি নড়ল না। থাক, কিছু বলে লাভ নেই।

শিয়াল ভাবল, তাহলে মরাই হবে। তবে আরেকটু নিশ্চিত হওয়া দরকার। রিস্কে যাওয়া ঠিক হবে না। বাঁশের একটি কঞ্চি জোগাড় করে জোরে একটা গুতা দিল এবার।

হাতি তবুও কিছু বলল না।

শিয়াল মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেল হাতি মরেই গেছে! তখন কাছে গিয়ে নখ দিয়ে পিঠে আঁছড় দিতে লাগল। হাতি মহা বিরক্ত হচ্ছিল তবুও শুয়ে ছিল চুপ করে। থাক, কিছুক্ষণ ডিস্টার্ব করে চলে যাক। বিকেলের ঘুমটা নষ্ট করে উঠে দাঁড়িয়ে লাভ নেই।

শিয়াল যখন অভার কনফিডেন্ট হয়ে গেল হাতি মরেই গেছে, তখন ভাবল জীবনে সাদা-কালো, হালাল-হারাম অনেক মুরগিই তো খেলাম; কিন্তু কখনো হাতির কলিজা খাওয়ার নসিব হয়নি। আজ যখন সুযোগটা পেয়েছি কাজে লাগাই।

আস্তে আস্তে হাতির পশ্চাদ্দেশের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল, কারণ, কলিজা পর্যন্ত পৌঁছার এটাই সহজ রাস্তা। কাছে গিয়ে শিয়াল যখন ... এর ভেতর মাথাটা ঢুকাল— আর তো সহ্য করা যায় না; ধৈর্যেরও একটা সীমা থাকে। হাতিকে অবশ্য তেমন কিছু করতেও হলো না। দরজার মুখটা দিলো টাইট করে। শেয়াল পড়ল আটকা। মাথা এখন ভেতরেও যায় না, বেরও হয় না...

জমানার খেকশেয়ালগুলো দূরে বসে বসে ইউটিউবে মাথা বের করে মাজহাব; তথা ইমাম আবু হানিফার নাম নিয়ে বকাঝকা করছিল। কেউ পাত্তা দেননি। করুক। কিছুদিন চিল্লায়া এমনিতেই নীরব হয়ে যাবে; কিন্তু না। দিন দিন বাড়তে লাগল তাদের বাটপারি। এখন অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, শেয়ালগুলো আইম্মায়ে মুজতাহিদিনের ইজ্জতের হারাম এলাকায় মাথা ঢুকিয়ে ফেলছে। এরপরে তো আর ছাড় দেওয়া যায় না, নিয়ম নেই।

আবু হানিফা ও বুখারি

আমি ঘি স্বীকার করি; কিন্তু দুধের অস্তিত্ব মানি না। আরে বেটা দুধ ছাড়া তুই ঘি পাবি কোথা থেকে?

তারা আবু হানিফা হজম করতে পারেন না আবার বুখারি মানেন। যদিও তাদের অনেকেই শুদ্ধকরে বুখারি উচ্চারণই করতে পারে না। বলে *বুকারি শরিফ*—সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে, ইমাম বুখারি এবং *বুখারি শরিফ* তাদের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য; অথচ ইমাম বুখারি যাদের কাছ থেকে হাদিস শিখেছেন, যাদেরকে শিখিয়েছেন, তাদের অধিকাংশই যে ইমাম আবু হানিফার ছাত্র, মূর্খতার কারণে এটা তারা জানে না; আর জানলেও ধান্ধাবাজির কারণে আন্ধা হয়ে থাকে বলে স্বীকার করে না। কী আর করা! ছাগল যদি পাগল হয়, সুস্থ করে তোলা যায়। কারণ, পাগলামি একটা রোগ। কিন্তু পাগল যদি ছাগল হয়ে যায়, তাহলে তাকে সারিয়ে তোলা যায় না। কারণ, ছাগলামি কোনো রোগ নয়। ছাগলামি মানে ছাগলামি। ছাগলামিকে আল্লাহর নবিগণও ভয় পেতেন।

ইসা আ. একবার রাস্তা দিয়ে দৌড়াচ্ছিলেন। তাঁকে পেছন থেকে তাড়া করছিল এক লোক। জিজ্ঞেস করা হলো, 'নবি, আপনি দৌড়াচ্ছেন কেন?'

তিনি বললেন, 'পেছনে আসা লোকটার জন্য।'

-আপনি হলেন আল্লাহর নবি। আপনি *কুম বি-ইজনিল্লাহ* বললে কবর থেকে মৃত মানুষ জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়! আপনি মাটি দিয়ে পাখি বানিয়ে আকাশের দিকে ছুড়ে দিলে আল্লাহর হুকুমে তার ভেতর রুহ চলে আসে এবং সে উড়ে যায়! ধবলরোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। সর্বোপরি আল্লাহর কাছে দুআ করলে আল্লাহ আপনার দুআ নিঃসন্দেহে ফিরিয়ে দেবেন না। সেই আপনি একটা লোকের কারণে এভাবে দৌড়াচ্ছেন?

ইসা আ. বললেন, 'এইলোক আহাম্মক। আস্ত একটা ছাগল; আর ছাগলামি কোনো

রোগ নয়—এক প্রকার আজাব। আমি আল্লাহর আজাব ডরাই।

দুই শ্রেণির কপালপোড়া আছে, যাদের সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। এক হলো সুদখেকো; আর অপর শ্রেণির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আহলে হাদিস ফিরকা।

দ্বিতীয় শ্রেণির কথা শুনে চোখ কপালে তোলার দরকার নেই। দলিল দিচ্ছি। দলিল শোনার পর যদি মনে হয় ভুল বলা হয়েছে, মনে মনে (ছোটখাটো) একটা গালি দিয়েন আমাকে, সমস্যা নেই।[৪৭]

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إن الله قال: من عادى لى وليا فقد أذنته فى الحرب.

আল্লাহপাক বলেছেন, আমার বন্ধুদের সঙ্গে যে শত্রুতা করবে, তার সঙ্গে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। এখন দুটি ব্যাপার প্রমাণ করা দরকার।

এক. ইমামে আজম আবু হানিফা আল্লাহর ওলি ছিলেন।

দুই. আহলে হাদিস ফিরকা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করছে।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না। এই কর্মটি তারা প্রকাশ্যেই করে বেড়াচ্ছেন। সুতরাং দেখবার বিষয় ইমাম আবু হানিফা আল্লাহর ওলির ক্যাটাগরিতে পড়েন কি না।

ওয়ালায়াতে আবু হানিফা

হিজরতে নববি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম শতকে যারা হজ করতেন, তাদের হজের কোয়ালিটি ছিল অন্যরকম। এখন তো যেমন হাজি তেমন তার এজেন্ট। হজকে আল্লাহর রহমতে রীতিমতো হজ বাণিজ্যে পরিণত করে ফেলা হয়েছে। কোনো রকমে একটা লাইসেন্স বের করে ফেলতে পারলে তো ভালো। না পারলে অন্য কারও লাইসেন্সে মাথা ঢুকিয়ে শুরু করে দেওয়া হচ্ছে ব্যবসা। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে হজ ট্র্যাভেলস। হজ ট্রাভেলসই বললাম। কারণ, এরা হলো মৌসুমি কারবারি।

হজ-ব্যবসায়ীরা আবার ইদানীং বিভিন্ন প্যাকেজও দিচ্ছে। না, হজের সুযোগ-সুবিধাজনিত ক্যাটাগরিওয়াইজ প্যাকেজের কথা বলছি না। এই প্যাকেজের প্যাকেটে থাকে দালালির রেইট। হাজি জোগাড় করে দিলে কমিশনের চার্ট। একজন দিলে ১০

---

[৪৭] *সহিহ বুখারি :* ৬৫০২।

হাজার, দুইজন দিলে ২০ হাজার, চারজন দিলে ৫০, সাতজন দিলে ১ লাখ আর ১৫ জন দিয়ে দিতে পারলে হজ ফ্রি।

নব্য হজ-ব্যবসায়ীদের এরকম রমরমা অফার পেয়ে কিছু লোক ইদুল আজহার পরের দিন থেকেই ছাত্তি-লাঠি নিয়ে বের হয়ে যায় হাজিদের সন্ধানে...আচ্ছা থাক, হজ-বাণিজ্য নিয়ে অন্য কোথাও বিস্তারিত বলা যাবে।

সাম্প্রতিক সময়ে যারা হজে যান, প্রত্যেকেরই নজর থাকে আয়েশের দিকে। পয়সা লাগে লাগুক, জান মুবারককে কষ্ট দেওন যাইব না! ফ্লেক্সিবল ফ্লাইট চেপে রিলাক্স করে কয়েক ঘণ্টায় পৌঁছে যাচ্ছেন জেদ্দায়। সেন্ট্রাল এসি ডুপ্লেক্স ফ্লাটের কিং সাইজ বাথটাবে লম্বা হয়ে গোসল-টুসল সেরে আরাম করে হজের আহকামাত আদায় করা যাচ্ছে—অনেকটা পিকনিক মোডে। মোড়ে মোড়ে সেলফিবাজ ভেলকি হাজিদের কথা আর নাই-বা বলি।

কিন্তু আগের সময়ে বেশিরভাগ হাজিকেই হজ করতে যেতে হতো পায়ে হেঁটে। ইমাম আবু হানিফা জীবনে ৫৫ বার হজ করার গৌরব অর্জন করেছিলেন। মনে রাখা ভালো, হজে যাওয়া মানে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়া। আল্লাহ যাদের পছন্দ করেন, শুধু তাকেই তাঁর ঘরে মেহমান বানিয়ে ডেকে নিয়ে যান। একজন মানুষকে যখন একবার, দু-বার না, ৫৫ বার কেউ তাঁর বাড়িতে দাওয়াত করে নিয়ে যায়, বুঝতে বাকি থাকে না দুজনের মধ্যে সম্পর্ক কতটা গাঢ়!

- আবু হানিফা ইরাকের লোক। কাবা শরিফ মক্কা নগরীতে। ৫৫ হজের ৪০টি হজই তিনি করেছিলেন পায়ে হেঁটে গিয়ে। উইকি জানাচ্ছে, কুফা থেকে মক্কার ড্রাইভিং ডিস্টেন্স ১,৭৮৯ কিলোমিটার। তাহলে পায়ে হাঁটা দূরত্ব কত হাজার কিলোমিটার? এতখানি পথ হেঁটে গিয়ে হজ করা, তা-ও একবার দু-বার না, ৪০ বার, চাট্টিখানি কথা? আছে এমন আরেকটি উদাহরণ?
- একদিন দুইদিন না, একবছর-দুইবছর না, একনাগাড়ে ৪০ বছর এশার নামাজের অজু দিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করা। প্রতি রাতে একই রাকআতে পূর্ণ কুরআন খতম করা... ইমাম আবু হানিফা ছাড়া দ্বিতীয় আরেকটি নাম কেউ বলুক।[৪৮]
- আবু হানিফা স্বপ্নে দেখলেন, নবিজির শরীর মুবারকের হাড়গুলো রওজা শরিফের মধ্যে ছড়িয়ে আছে! ঘুম থেকে উঠে খাদিমকে পাঠালেন বিশ্ববরেণ্য

[৪৮] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ৬/৩৯৯, ৪০০, ৪০১।

খোয়াব বিশেষজ্ঞ আল্লামা ইবনে সিরিনের কাছে। স্বপ্নের কথা শুনে তিনি বললেন, 'কে দেখেছে এই স্বপ্ন'?

খাদিম বলল, 'যিনি দেখেছেন, তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন নাম বলতে।'

ইবনে সিরিন বললেন, 'তোমার আর বলার দরকার নেই। এই স্বপ্ন ইমাম আবু হানিফা ছাড়া কেউ দেখতেও পারবে না। যাও গিয়ে বলো, আল্লাহপাক তাঁর মাধ্যমে আহাদিসে রাসুল ও সুন্নাতে নববির খেদমত নেবেন।' হলোও তাই।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিশ্বনবির হাদিসগুলোকে যদি ইমাম আবু হানিফা জড়ো করে লিখে দিয়ে না যেতেন, ঘাঁটাঘাঁটি করে মাসায়িল বের করে না দিতেন, তাহলে আমরা সাধারণ মুসলমানরা ইবাদতের ক্ষেত্রে পড়তাম চরম বিপাকে। কোনো একটি হাদিসের কিতাব ঘাঁটাঘাঁটি করে সকল ইবাদতের যাবতীয় নিয়মনীতি বের করা সম্ভব হতো না। ইমাম সুয়ুতি হানাফি মাজহাবের অনুসারী ছিলেন না; কিন্তু সত্য স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি তিনি। তিনি বলে গেছেন—

إنه أول من دون علم الشريعة ورتبه أبوابا، ثم تابعه مالك بن أنس فى ترتيب الموطأ، ولم يسبق أبا حنفة أحد. تبييض الصحيفة، ص٣١٥

আবু হানিফাই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইলমে শরিয়তকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে লিখেছিলেন। ইমাম আবু হানিফা যদি দীন লিখে দেওয়ার ব্যবস্থা না করতেন, আমাদের ক্ষমতা থাকত না দীনের ওপর আমল করার।

এখানেও মূর্খরা প্রশ্ন তোলে। বলে, ইমাম আবু হানিফা যদি দীন লিখে গিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর কিতাব কই?

এদের সামনে *মুসনাদে আবু হানিফা, আল ফিকহুল আকবর, ওয়াসিয়াতু আবু হানিফা, কিতাবুল আসার লি আবি হানিফার* নাম না বলে পালটা প্রশ্ন করি, লিখে যাওয়া মানে নিজ হাতে লিখে যেতে হবে—এই কথা তোমাদের কে শেখাল? আর নিজে কিছু না লিখলে বুঝি লেখা হয় না? মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ কয়খান কিতাব লিখে গেছেন? নবির ক্ষেত্রে তাহলে কী বলবে তুমি?

বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে লেখেননি; কিন্তু লেখিয়ে গেছেন। বড়রা এভাবেই কাজ করে যান। ইমাম আবু হানিফার ৪০ জন মুহাদ্দিসের একটা প্যানেল ছিল। *নাসবুর রায়াহ* এবং *এলাউস সুনানের* ভূমিকায় বলা আছে—

إن الذين دونوا الكتب لأبى حنيفة كانوا أربعين رجلا.

ইমাম সারারাত জেগে কুরআন-হাদিস ঘেঁটে মাসআলা বের করতেন। সকালবেলা প্যানেলের সামনে উপস্থাপন করে বলতেন, 'মাসআলাগুলো কুরআন-হাদিসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখোতো ঠিকটাক হলো কি না? কোনো আয়াত বা হাদিসের খেলাফ হলো কি না?'

ইমাম আবু হানিফার 'আমার কোনো মাসআলার বিপরীত সহিহ হাদিস পাওয়া গেলে আমার কথা ছুঁড়ে ফেলে হাদিসে আমল করে নিয়ো'—কথাটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য কারা, কিছুটা কি আন্দাজ করা গেল? কথা একটা পেলেই না বুঝে লাফালাফি করা তো মূর্খদের কাজ। এমনই এক মূর্খের কথা জানাই। সে ঘোষণা করল, আমি কোনো হাদিস মানি না।

—বাবা তুই মানলে মান, না মানলে নাই। কেউ কি তোকে হাদিস মানতে বাধ্য করছে নাকি?

—তা করেনি। তবে আমি হাদিস মানি না রাসুলের কথার ওপর আমল করি।

—মানে কী?

—রাসুল বলেছেন,

لا تكتبوا عنى غير القران.

তোমরা কুরআন ছাড়া আমার আর কোনো কথা লিখো না।[৪৯]

তো রাসুল নিজে যেখানে পরিষ্কার নির্দেশ দিচ্ছেন কুরআন ছাড়া রাসুলের আর কোনো কথা যেন লেখা না হয়, সেখানে *বুখারি-মুসলিম*-সহ শত শত হাদিসের কিতাব লেখাটাই তো রাসুলের ফরমানের খেলাফ হয়েছে। এ জন্য আমি কোনো হাদিস মানি না!

—তাই নাকি?

—জি।

—আচ্ছা তুমি যে *লা তাকতুবু আন্নি গাইরাল কুরআন* বাক্যটি বললে, সেটা কোন সুরার কত নম্বর আয়াত?

—এটা কুরআনের আয়াত নয়।

—তাহলে রাসুল যে এ কথা বলেছেন, তুমি জানলে কীভাবে?

—হাদিসে পেয়েছি।

—হাদিস তো মানা যাবে না। তুমি নিজেই বলেছ। এখন উপায়?

আসলে এগুলো হলো মূর্খতা। কোনো কথা পেলে সেটার আগের কথা, পরের কথা,

---

[৪৯] *মুসলিম*: ৩০০৪।

অবস্থা, উদ্দেশ্য কোনো কিছু না জেনে পণ্ডিতি দেখানো মূলত শেয়াল পণ্ডিতি। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এমনও অনেক শব্দ আছে, যেগুলো স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একেক আঙিনায় একেক অর্থ প্রকাশ করে। একটি মাত্র শব্দের উদাহরণ দিচ্ছি। শব্দটি হলো কালিমা। কালিমা শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো 'শব্দ'। একক অর্থবোধক শব্দ; কিন্তু একেক মহলে কালিমা একেক অর্থ প্রকাশ করে।

আপনি যদি সকাল বেলার মক্তবে গিয়ে প্রশ্ন করেন, কালিমা কাকে বলে? ছাত্ররা বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। আপনি বলবেন, সাবাশ!

আপনি যদি আরবি গ্রামারের ক্লাসে গিয়ে প্রশ্ন করেন, কালিমা কাকে বলে? সে বলবে, *আল কালিমাতু লফজুন উজিয়া লি-মানান মুফরাদান/ মুফরাদিন/ মুফরাদুন।* আপনি বলবেন, সাবাশ! স্থানের ভিন্নতায় অর্থ বদলে গেছে। আবার উভয় অর্থই ঠিকাছে।

আবার দেখুন,

মক্তবের ছাত্রকে যদি আপনি বলেন, বাবা কালিমা বলো; আর সে যদি বলে *বিসমিল্লাহির রাহমামির রাহিম,* আপনি বলবেন ভুল। আবার গ্রামারের ক্লাসে গিয়ে যদি শুনেন ক্লাসের বাইরে রাস্তায় কেউ কাউকে গালি দিচ্ছে; আর আপনি ছাত্রদের জিজ্ঞেস করেন, 'এই লোকটি কী বলেছে?' ছাত্ররা বলবে, 'কালিমা'। আপনি বলবেন, 'উত্তর সঠিক হয়েছে।' আরবি গ্রামার ক্লাসে 'কালিমা' মানে অর্থবোধক শব্দ। আর গালির একটা অর্থ আছে।

এক জায়গায় 'কালিমা' জিজ্ঞেস করার পর ছাত্র *বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম* বললেও সেটা ভুল হয়। অন্য জায়গায় গালি দিলেও সেটা কালিমা হয়। আবার আপনি যদি এই লেখা পড়ে পুরোটা ব্যাখ্যা না করে কোনো সাধারণ মুসলমানের কাছে গিয়ে বলেন, গালিকেও 'কালিমা' বলে, তাহলে সতর্কতাস্বরূপ অবশ্যই আপনাকে হেলমেট পরে কথা বলা দরকার।

এভাবে বললে সারারাত বলা যাবে। ইমাম আবু হানিফার ব্যাপারে কিছু কথা উল্লেখ করলাম। আশাকরি কারও বুঝতে বাকি নেই আবু হানিফা আল্লাহর একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন? এই যখন অবস্থা তখন তো মনে হয় আবু হানিফার দুশমন আহাফিদের বলে দেওয়াই উচিত 'আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকো তথা আল্লাহর গজবের জন্য অপেক্ষা করো!'

আর এরপরেও যদি আবু হানিফার অবস্থান বুঝতে সমস্যা হয় কারো তাহলে তারও উচিত কপালপোড়াদের তালিকায় নাম তালিকাভুক্ত করিয়ে নেওয়া। খামাখা টাইম ওয়েস্ট করে লাভ কী!

দূরদর্শী আবু হানিফা

এক লোক এশার নামাজ আদায় করে শুয়েছিল। ফজরের ওয়াক্তের আগে তার ঘুম ভাঙল। তাকে এখন গোসল করতে হবে। কারণ, ঘুম থেকে জেগেই সে টের পেল তার গোসল করা দরকার। বিনা গোসলে নামাজ হবে না। এখন কি তাকে আবার এশার নামাজ পড়তে হবে?

সাথিদের নিয়ে বসে ছিলেন ইমাম সাহেব। কোথা থেকে জানি ছুটে আসলো একটি ছেলে। বয়স ১৪/১৫-এর বেশি হবে না। এসেই জানতে চাইল মাসআলা। ইমাম সাহেব একপলক তাকালেন ছেলেটির দিকে। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, তাকে আবার এশার নামাজ পড়তে হবে'।

ছেলেটি সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। উপস্থিত মুহাদ্দিস ও ফকিহগণ তাকিয়ে রইলেন আবু হানিফার দিকে। ইমাম সাহেব এ কেমন ফতোয়া দিলেন! বেচারা এশার নামাজ পড়েই তো ঘুমালো। ফজরের আগে তার গোসল ওয়াজিব হলে এশার নামাজের তো সমস্যা হয়নি, গোসল করে ফজরের নামাজ এ-না পড়বে। তবে যে ইমাম সাহেব বললেন...

একজন জিজ্ঞেস করলেন, বেআদবি মাফ করবেন হজরত। আমরা তো কিছুই বুঝলাম না। ছেলেটি কী জানতে চাইল আর আপনি তাকে কী জবাব দিলেন?

তিনি বললেন, সে যা জানতে এসছিল আমি তো সেটারই জবাব দিয়েছি।

—কিন্তু কেমনে কী?

—আসলে ঘটনাটি আর কারও নয়। ছেলেটি তার নিজের ব্যাপারেই জানতে চেয়েছে। লজ্জার কারণে নিজের রেফারেন্স দেয়নি। আমি তার বাচনভঙ্গি আর চেহারার লজ্জালজ্জা ভাব দেখেই এটা অনুমান করে নিলাম। এখন ব্যাপার দাঁড়াল এই যে, সে যখন এশার নামাজ পড়েছিল, তখন তার ওপর নামাজই ফরজ হয়নি। সে যেটা পড়েছিল, ওটা নফল হিশেবে তার বাবা-মার একাউন্টে জমা হয়ে গেছে। যখন ঘুম ভাঙল তার, টের পেল গোসল ওয়াজিব হয়েছে, তার মানে মাত্রই সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে। আর তখনো এশার ওয়াক্ত বাকি ছিল। অর্থাৎ, নামাজ ফরজ হওয়ার পর তার সামনে তখন এশার ওয়াক্ত। সুতরাং নতুন করে এশার নামাজ পড়া তার ওপর ফরজ।

প্রায় শতাধিক মুহাদ্দিস বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন!

ইমাম আবু হানিফা শুধু একজন ফকিহই ছিলেন না, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন জহুরিও ছিলেন। জহুরি বলার কারণ, ওই ছেলেটি চলে যাওয়ার পর ইমাম সাহেব মন্তব্য করেছিলেন, 'তোমরা দেখো, এই ছেলে একদিন অনেক বড় হবে।'

কিছুদিন পর ছেলেটিকে তার বাবা নিয়ে আসলেন ইমামের খেদমতে।

—হুজুর, আমি আমার ছেলেকে আপনার এখানে ভর্তি করিয়ে দিতে চাই। আমি চাই আমার ছেলেটি আপনার কাছে থেকে বড় একজন আলিম হোক। ছেলেরও তাই ইচ্ছা। আর নিজের ছেলে বলে বলছি না, আমার ছেলের মেধা-স্মৃতিশক্তি খুবই উচ্চ পর্যায়ের। একবার কিছু ভালো করে পড়ে ফেললে খুব সহজে আর ভুলে না।

ইমাম সাহেব বললেন, আপনার ছেলে অনেক বুদ্ধিমান এবং স্বপ্রতিভ বুঝতে পারছি; কিন্তু আমাদের একটা উসুল আছে। আমরা হাফিজে কুরআন ছাত্র ছাড়া অন্যদের ভর্তি করি না। সুতরাং, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ছেলের হাত ধরে মলিন চেহারায় বিদায় নিলেন বাবা। এক সপ্তাহ পরে ছেলেটি আবারও এসে উপস্থিত হলো ইমাম সাহেবের সামনে। ইমাম বললেন, বাবা তোমাকে না বলে দিলাম এখানে হাফিজ ছাড়া কোনো ছাত্রকে ভর্তি করা হয় না। যাও, আগে হাফিজ হয়ে আসো গিয়ে।

ছেলেটি জবাব দিলো, কত নম্বর পারা থেকে টেস্ট নিবেন, নেন।

—বলো কী! এক সপ্তাহে?

—জি, আল্লাহর মেহেরবানি।

ছেলেটি ভর্তি হলো। সে বড় হলো। আক্ষরিক অর্থেই বড় হলো সে। বয়সে, মেধায়, ইলমে, আমলে। কিয়ামত পর্যন্ত ইমামতের নামের পালকে আলোচিত হওয়ার মতো বেড়ে উঠতে লাগল ছেলেটি। ছেলেটির বাবা তাঁর নাম রেখেছিলেন মুহাম্মাদ। আমরা যাকে বলি ইমাম মুহাম্মাদ।

ইমামে আজম আবু হানিফার প্রধান দুই সোলজার, 'সাহাবাইন' নামে খ্যাত ইমাম কাজি আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদই হলেন সেই ছেলে, যাঁর গল্প বলা হলো।[৫০]

ইমামের স্পষ্টবাদিতা

ইমামের মাঝে ভনিতা ছিল না। যা ভাবতেন তা-ই বলতেন। যা বলতেন পরিষ্কার করেই বলতেন। এ ব্যাপারে ইমামের বিখ্যাত সেই কথাটি উল্লেখ করা যায়। ইমাম বলেন,

ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس و العين، وما جاء عن الصحابة اخترنا، وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال.

[৫০] *বুলুগুল আমাসি ফি সিরাতিল ইমাম মুহাম্মদ ইবনিল হাসান আশ-শায়বানি* : ৫।

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো হাদিস পেলে সেটা আমার মাথার তাজ, চোখের মনি। সাহাবি থেকে কোনো কথা পেলে আর সেটায় বৈপরীত্য থাকলে আমরা এক সাহাবির কথা গ্রহণ করি; কিন্তু অন্যজনেরটা অস্বীকার করি না। আর কোনো তাবিয়ি থেকে কোনো কথা পেলে ব্যস, তারাও পুরুষ আমরাও পুরুষ![৫১]

আবু হানিফা নামকরণ

মহিলা প্রশ্ন করলেন আবু হানিফার কাছে, 'এক পুরুষ যদি একই সাথে চার স্ত্রী রাখতে পারে, তাহলে একজন নারী কেন একই সাথে চারজন স্বামী রাখতে পারবে না? এটা কেমন ইনসাফ?'

ইমাম জবাব দিতে পারলেন না। তাঁর কাছে কুরআন-হাদিস আছে। জবাব দিতে পারেন; কিন্তু মহিলা দলিল চাচ্ছে না। সে প্রশ্ন উঠিয়েছে যুক্তির মানদণ্ডে। তিনি কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। রাতে ঘরে ফিরে পায়চারি করছেন। ঘুম আসছে না। ইমাম সাহেবের মেয়ে জিজ্ঞেস করল,

—বাবা, কী হয়েছে?

—নারে মা, কিছু না।

—তাহলে ঘুমোচ্ছেন না কেন?

—ঘুম আসছে না। তুই ঘুমা গিয়ে।

—কিছু একটা তো বাবা হয়েছেই। আমি কি কোনো হেল্প করতে পারি?

—তুই কী হেল্প করবি?

—কী হেল্প করব বা কিছু করতে পারব কি না, না বললে বুঝব কী করে।

স্বলজ্জ কণ্ঠে মেয়ের কাছে ঘটনা খুলে বললেন আবু হানিফা। মেয়ে স্মিত হাসল। তিনি বললেন, আমি এতবড় লজ্জায় পড়েছি আর শুনে তুই হাসছিস?

—সরি বাবা। আচ্ছা আমি যদি সমাধান দিতে পারি, তাহলে আমাকে কী দেবেন?

—তুই সমাধান দিতে পারবি?

—পারতেও তো পারি। যদি পারি...

—কী চাস তুই?

---

[৫১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৬/৪০১।

—আপনাকে ওয়াদা দিতে হবে আপনার নামের সঙ্গে আমার নাম যুক্ত করে নেবেন।

ইমাম সাহেব রাজি হলেন। মেয়ে বলল,

আমাকে রাত পর্যন্ত একটু সময় দিন। আগামীকাল আপনি আপনার সমাধান পেয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দৃষ্টি বিনিময় হলো বাবা-মেয়ের মাঝে। দুজন চলে গেলেন যার যার রুমে।

মেয়ে পরদিন এক পেয়ালা দুধ নিয়ে এসে ইমাম সাহেবকে বলল, বাবা এই পেয়ালায় চারটি ছাগলের দুধ মিক্স করা আছে। আপনি আমাকে প্রত্যেকটি ছাগলের দুধ আলাদা করে দিন তো...

ইমাম সাহেব বললেন, থ্যাংক ইউ মা।

তিনি সমাধান পেয়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন একসঙ্গে একজন মহিলার কেন চারজন স্বামী রাখতে পারা উচিত না। মেয়েকে দেওয়া ওয়াদা মতো সেদিন থেকে মেয়ের নাম যুক্ত করে নিলেন নিজের নামের সঙ্গে। মেয়ের নাম ছিল হানিফা। তাঁর নাম নুমান বিন সাবিত। সেদিন থেকে নুমান বিন সাবিত হয়ে গেলেন আবু হানিফা, মানে হানিফার বাবা।

মানুষ পরিচিতি পায় তার কর্মের মাধ্যমে। আবু হানিফা এতবড় ইমাম আর তাকে কিনা নিজের মেয়ের নামে পরিচিত হতে হলো?

এটি হলো লা-মাজহাবিদের প্রচারিত বক্তব্য। আর তারা তাদের এই বক্তব্যকে বাজারজাত করবার জন্য উপরের কাহিনিও উৎপাদন করে রেখেছে; অথচ পাগল-ছাগলের জানা নেই ইমাম আবু হানিফার 'হানিফা' নামে মেয়ে থাকা তো পরের কথা, তাঁর কোনো কন্যাসন্তানই ছিল না। তাঁর একমাত্র পুত্রের নাম ছিল হামমাদ। ইমাম হামমাদ রাহ.।

জেবুননেসা আলমগির

আবু হানিফার নামকরণ নিয়ে কথা হচ্ছে। মনে পড়ল যখন তখন আরেকজন মেয়ের কথা জানাই। আবু হানিফার নামে বানানো মেয়ের বুদ্ধিদ্বীপ্ত ঘটনার মতো হলেও এটি কিন্তু বানানো মেয়ের বানানো কিচ্ছা না, সত্যি ঘটনা।

আওরঙ্গজেব আলমগির ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের অত্যন্ত প্রভাবশালী সম্রাট। ১৬৫৮ থেকে ১৭০৭ পর্যন্ত মোগল সম্রাট হিশেবে শাসক ছিলেন সম্রাট শাহজাহানপুত্র

আলমগির। বাদশাহ আলমগিরের নির্দেশে রচিত ইসলামি আইনশাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাব *ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি* আজও মুসলিমবিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্সগ্রন্থ হিশেবে মূল্যায়িত হয়ে থাকে।

তখনকার সময়ে কাব্যচর্চা ছিল ইন্টারন্যাশনালি। প্রযুক্তির উৎকর্ষে এখন আমরা গ্লোবাল ভিলেজের যতই স্লোগান দেই, তখনও কিন্তু কম ছিল না। অন্তত সাহিত্যচর্চার দিক দিয়ে। ফার্সি ছিল তখনকার কাব্যিক ভাষা। পারস্যের শাহজাদা একটি ছন্দ লিখলেন—

দুররে আবলক কসে-কমদি-দাহ মওজুদ
ওয়া লেকিন—
ওয়া লেকিন—

আর এগোতে পারেন না। পরের ছন্দ আর মেলাতে পারেন না। তিনি তাঁর কবি বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করলেন। সাহায্য চাইলেন। একদিন, দুইদিন, এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ... না, পরের ছন্দ তো আর মিলে না। ব্যাপারটি বাদশাহর নজরে এলো। তখনকার সময়ে মুসলিম শাসকদের রাজদরবারে কবিদের কদর ছিল। তখন কবিতার আসর বসত তখনকার হোয়াইট হাউস বা বঙ্গভবনগুলোতে!

রাষ্ট্রপ্রধান মাইকিং করালেন সারা দেশে। (মাইকিং বললাম বোঝার জন্য। কেউ যেন আবার মাইকের জন্ম ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটিতে না লেগে যান) ঘোষণা করা হলো, কবিতার পরের ছন্দটি যদি কোনো কবি লিখে দিতে পারেন, তাহলে তাকে বড় ইনাম দেওয়া হবে।

দিন যায়, সপ্তাহ, মাস যায়, কোনো জবাব আসে না। অবশেষে মন্ত্রিসভায় আলোচনা-সাপেক্ষে ছন্দটি লিখে পাঠানো হলো বাদশাহ আলমগিরের কাছে। এই বিশ্বাসে—আলমগিরালয়ে বড় বড় কবি আছেন। তারা নিশ্চয়ই পারবেন।

বাদশাহ আলমগির রাজকবিদের ডাকলেন। ছন্দটি তুলে দিলেন তাদের হাতে। এটি পারস্যের রাজ্যসভা থেকে পাঠানো হয়েছে। পরের ছন্দটি লিখে দিতে হবে। ইজ্জতকা সওয়াল।

কবিরা আশ্বস্ত করলেন সম্রাটকে। কোনো চিন্তা করবেন না আলমপনা। আমরা আপনার মাথা নীচু হতে দেবো না। আস্থা রাখুন।

সম্রাট আস্থা রাখলেন। বেশ কয়েক সপ্তাহ চেষ্টা করলেন রাজকবিগণ। অবশেষে অপারগতা জানালেন তারাও। তাদের পক্ষেও সম্ভব হলো না পরের ছন্দটি মিলিয়ে দিতে। একটি মাত্র নতুন লাইন হলেই হয়ে যায়; কিন্তু সম্ভব হলো না সেটা। সম্রাট পড়লেন ভীষণ লজ্জায়। পারস্যবাসীর কাছে মান সম্মানটা আর বজায় রাখা গেল না।

ভালো কথা, ফার্সিতে কথিত প্রথম লাইনটি, *দুররে আবলক কসে কমদী- দামওজুদ* মানে হলো, 'সাদা-কালো মিশ্রিত মূতির একত্র হওয়া দুষ্কর। অর্থাৎ, সাদা এবং কালোর মিশ্রণে ঝুলে থাকা সৌন্দর্য কোথাও পাওয়া যায় না, তবে... সমস্যা তৈরি হয় তারপরেই। কবিদের ভাবনারা দোল খায়, চষে বেড়ায় ফারস থেকে ফোবানায়। উপকূলীয় ঢেউ খেলে ডানা মেলে প্রেমের তীর্থালয়ে, মমতাজের আঙিনায়।

অন্দরমহলে পায়চারি করছিলেন সম্রাট। ব্যাপারটি লক্ষ করল তাঁর মেয়ে। জেবুননেসা নাম। অত্যন্ত প্রখর ধী-শক্তি আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতি মেয়ে।

—বাবা কী হয়েছে?

—নারে মা, কিছু না। তুই ঘুমাসনি?

—তুমিও তো ঘুমাচ্ছ না। সমস্যা কী বাবা?

—আছে একটা। তোর জেনে কাজ নেই। এটা তোর সাবজেক্ট না।

—আমিতো জানি আমার সাবজেক্ট না তবুও জানতে চাইছি। কারণ, যেহেতু আমার বাবার সাবজেক্ট। বাবার আনন্দে ভাগ নেব আর কষ্টের কথা একটু শুনবও না, এটা কি ঠিক?

বাদশা আলমগির খুলে বললেন কবিতার কথা। বললেন, আমার কবিগণ ব্যর্থ হয়েছে পরের লাইনটি মেলাতে। দু-চার দিনের মধ্যে আমাকে 'সরি' বলে অপারগতার কথা জানিয়ে দিতে হবে—ভাবতেই নিজেকে খুব ছোট লাগছে।

মেয়ে বলল, আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি বাবা। সরি, এটা আসলেই আমার সাবজেক্ট না। আমার সাধ্যের মধ্যে হলে চেষ্টা করতাম আমি। বাদ দিন, যা হবার হবে, এখন ঘুমান। না হলে শরীর খারাপ করবে।

পরদিন দুপুরবেলা জেবুননেসা গোসল করে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসেছেন। অনেকগুলো মেয়ে (তখনকার ভাষায় দাসী) সম্রাটকন্যার গোসল পরবর্তী রূপচর্চায় মশগুল। তার চুল ছিল হাটু অবধি লম্বা। কেউ তার চুলগুলো টাওয়েল দিয়ে মুছে দিচ্ছিল, কেউ চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে দিচ্ছিল আবার কেউ চোখে সুরমা লাগিয়ে দিচ্ছিল। রকমারি পারাফউমের মৌ মৌ গন্ধে ছেয়ে আছে সারা রুম। সবাই মিলে হৈ-হুল্লোড় করছে। অন্দরমহল কোলোড়িত হচ্ছে হাসির শব্দে! হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেল সম্রাটকন্যার। হাসলেও মানুষের চোখে পানি আসে।

সামনের দেয়ালে বিশাল আয়না। হাসতে হাসতে জেবুননেসার চোখ পড়ল আয়নায়! থমকে দাঁড়ালেন তিনি! ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। কারণ, তিনি দেখতে পেলেন

তার চোখ থেকে পানির ফোটা টপকাচ্ছে; আর অবাক করা ব্যাপারটি হলো চোখে সুরমা দেওয়ায় পানির সঙ্গে সুরমা মিশে গিয়ে এমনভাবে পানি টপকাচ্ছে চোখ থেকে, মনে হচ্ছে যেন সাদা আর কালো কিছু একসঙ্গে ঝুলে আছে! সঙ্গে সঙ্গেই কাগজ-কলম বের করলেন তিনি। কবিতার পরের লাইনটি তিনি পেয়ে গেছেন, *মগর আশিক বুতানে সুরমা আলুদ*। 'প্রেমিক যদি চোখে সুরমা দিয়ে হাসতে হাসতে এক ফোঁটা পানি ঝরাতে পারে।'

এবার দুই লাইন একত্র করি।

درا بلق کے کم دیدہ موجود

مگر اشک بتانِ سرمہ آلود

অর্থাৎ, সাদা আর কালো মূতি একত্রে পাওয়া দুষ্কর
তবে প্রেমিক যদি চোখে সুরমা দিয়ে হাসতে হাসতে এক ফোঁটা পানি ঝরাতে পারে, তাহলে সম্ভব।

জেবুননেসা তৃপ্ত।

ছন্দটি লিখে নিয়ে গেলেন বাবার কাছে। বাদশা আলমগিরের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। মেয়েকে বুকে টেনে নিলেন। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, আমার কাছে তো একদম পারফেক্টই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, হলে হোক না হলে নেই, ইজ্জত তো বাঁচল। 'পারিনি' তো আর বলতে হবে না।

ছন্দটি তিনি দেখালেন তার রাজকবিদের। তারাও সায় দিলেন। বললেন, এরচেয়ে চমৎকার লাইন আর হতেই পারে না। আপনি মাথা উঁচু করেই পাঠিয়ে দিন জাহাপনা। সম্রাট ছন্দটি পাঠিয়ে দিলেন পারস্যে। পারস্যবাসী এটা পেয়ে আনন্দে অতিশয্যা। তারা আবেদন জানালো, যে কবি এই লাইনটি লিখেছেন, পারস্যবাসী সেই কবিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সংবর্ধনা দিতে চায়।

এই আনন্দসংবাদ পেয়ে সম্রাট আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মেয়েকে ডেকে বললেন,

মা-রে, আগের বেইজ্জতিই তো আমার জন্য ভালো ছিল। এখন তো দুনিয়া-আখেরাত, উভয় জাহানের বেইজ্জতিতে পড়ে গেলাম।

মেয়ে বলল, কী হয়েছে বাবা?

—পারস্যবাসী এখন কবিকে সংবর্ধনা দিতে চায়। এখন আমি তোকে কীভাবে তাদের সামনে উপস্থাপন করি? আল্লাহর কাছে গিয়ে কী জবাব দেবো?

জেবুননেসা বললেন, ও আচ্ছা এই কথা!

—তুই যেভাবে হালকা করে 'ও আচ্ছা' বললি, তাতে তো মনে হয় এটা কোনো ব্যাপারই না। তুই কি ঘটনার ভয়াবহতা বুঝতে পারছিস?

—পারছি বাবা। আর হালকা করে দেখছি। কারণ, আগেরটা সমস্যা ছিল; এখনকারটা আমার কাছে কোনো সমস্যাই মনে হচ্ছে না।

—মানে কী? তুই বেপর্দা হবি তাদের সামনে, এটা তোর কাছে কোনো সমস্যা মনে হচ্ছে না?

—আমি কি তাই বলেছি নাকি?

—তাহলে?

—বলছি। শান্ত হয়ে বসুন আর শুনুন। আমার একটি কবিতাই তো এই সমস্যার তৈরি করেছে, তাই না? দাঁড়ান, আরেকটি লিখে দিচ্ছি। আশাকরি সমাধান হয়ে যাবে।

—কী লিখবি তুই?

—তাতো তুমি দেখতেই পাবে। আগে লিখি তারপর নিজেই দেখো—বলেই রহস্যময় একটা হাসি দিলেন কন্যা। আলমগির বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন। বাবাকে একপ্রকার ঘোরের মাঝে রেখেই নিজ কক্ষে চলে গেলেন তিনি। আলমগির আর তাঁর এই মেয়ে, বাবা-মেয়ের মাঝে সম্পর্কটাই একটু অন্যরকম। কখনো বন্ধুর মতো। যে কারণে মেয়ে কখন বাবাকে আপনি করে বলে আর কখন তুমি করে, সে নিজেও বুঝে না। শুধু বুঝে, সে যখন কোনো কারণে আবেগতাড়িত হয়, বাবাকে তখন সে তুমি করেই বলে।

পরের দিন আরেকটি কবিতা লিখে বাবাকে দিলেন জেবুননেসা। বললেন, এটি তাদের কাছে পাঠিয়ে দিন বাবা। আমার বিশ্বাস তারা আর আমাকে খুঁজবে না।

—এখানে তুই কী লিখেছিস?

—তুমি বুঝবে না বাবা। কবিদের ভাবসাব অকবিরা কীভাবে বুঝবে!

বাবা-মা দুজনেই শব্দ করে হেসে উঠলেন।

জেবুননেসা লিখলেন,

در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل

ہر کہ دیدن میل دارد در سخن بیند مرا

দর সখুন মখফি মনম চুঁ বুয়ে গুল দর বুরগে গুল
হরকে দিদন ময়লে দারদ দর সখুন বিনদ মেরা।

> অর্থাৎ, আমি আমার কথার মাঝে এভাবে লুকিয়ে থাকি, ফুলের গন্ধ যেভাবে তার পাপড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকে। কেউ যদি আমাকে দেখতে চায়, সে যেন আমার কথাকে দেখে নেয়।

এই কবিতা পাওয়ার পর পারস্যবাসী বুঝে গেল এই কবি কোনো পর্দানশীন মহিলা হবেন। তারা আর জোরাজুরিতে গেল না। একঢালী উপহারসামগ্রী পাঠিয়ে দিলো অদেখা কবির সম্মানে।

আবু হানিফা কেন আবু হানিফা

আবু হানিফার নাম নুমান, বাবার নাম সাবিত। বাবার সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর নাম নুমান বিন সাবিত। কুনিয়ত ছিল আবু হানিফা আর লকব ইমামে আজম। এখন প্রশ্ন হলো, ইমাম সাহেবের যেহেতু কোনো মেয়েই ছিল না, তাহলে তিনি আবু হানিফা হন কীভাবে?

জবাব বোঝার আগে জানা থাকা দরকার আরবিতে 'আবুন' মানে 'বাবা', 'উম্মুন' মানে 'মা' হলেও সবসময় সকল স্থানে 'আবুন' মানে 'বাবা' হয় না, 'উম্মুন' মানেও 'মা' হয় না। অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 'উম্মুন' 'মা' অর্থে ব্যবহৃত হয়, 'সারমর্ম' অর্থে ব্যবহৃত হয়; আবার কখনো 'ঠিকানা' অর্থেও। কুরআনে কারিমে তিনটিরই উদাহরণ আছে। যেমন :

أمه صديقة (উম্মুহু সিদ্দিকাহ) তার মা সত্যবাদী।

هن أم الكتاب (হুন্না উম্মুল কিতাব) কুরআনের সারমর্ম।

فأمه هاوية (উম্মুহু হাউয়িয়াহ) তার ঠিকানা জাহান্নাম।

ঠিক সেভাবে 'আবুন' মানেও সবসময় 'বাবা' হয় না। কখনো কখনো 'ওয়ালা' অর্থেও ব্যবহৃত হতো। যেমন 'আবু হুরায়রা'। তাঁর নাম তো ছিল আবদুর রহমান। এমন তো না যে, 'বিড়ালছানা' তাঁর মেয়ে ছিল। তারপরেও তিনি 'আবু হুরায়রা' কেন?

কারণ, বিড়াল পছন্দ করতেন তিনি। সাথে সাথে রাখতেন। একদিন হুজুরের সামনে চাদরের নিচ থেকে বিড়ালের বাচ্চাটি বেরিয়ে পড়েছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজা করে বলে উঠলেন, *ইয়া আবা হুরায়রা!* হে বিড়ালওয়ালা! সেদিন থেকে তিনি হয়ে গেলেন আবু হুরায়রা বা বিড়ালওয়ালা।

মসজিদে নববিতে শুয়ে ছিলেন হজরত আলি। শরীর ছিল ধূলোমাখা। দেখে মনে হচ্ছিল সারা গায়ে বুঝি মাটি মেখে বসে আছেন! ঠিক সেই মুহূর্তে শ্বশুর সাহেব উপস্থিত হলেন। হজরত আলির শ্বশুরকে কি চিনিয়ে দিতে হবে?

জামাইকে এই অবস্থায় দেখে মজা করে বলে উঠলেন, *ইয়া আবাত-তুরাব:* 'ও মাটির বাপ'। আলি রা.-এর ১৫ ছেলে আর ১৮ মেয়ের মধ্যে কারও নাম 'তুরাব' ছিল না। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আলিকে 'আবু তুরাব' বলছিলেন, ফাতিমার গর্ভে জন্ম নেওয়া আলির তিন ছেলের নাম ছিল হাসান, হুসাইন এবং মুহসিন; কেউ 'তুরাব' ছিল না। থাকার কারণও ছিল না। 'মাটি' কারও নাম হয় না। অবশ্য বাঙালিদের মাঝে 'তুরাব আলি' নামের মানুষেরও দেখা মিলে। এটা অর্থের চিন্তা-টিন্তা না করেই কেউ কেউ রেখে দেয় হয়তো।

তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আলিকে 'হে আবু তুরাব' বলেছিলেন, তার অর্থ 'হে মাটির বাবা' নয়। এর মানে, 'হে মাটিওয়ালা'।

ঠিক সেভাবেই 'হানিফা' অর্থ খাটি, পিউর, ফ্রেস, নির্ভেজাল। যেমন, সুরা আলে ইমরানে বলা আছে—

﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾

ইবরাহিম আ.-এর আদর্শ একদম হানিফ বা নির্ভেজাল—তোমরা অনুসরণ করো। [সুরা আলে ইমরান : ৯৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন; আল্লাহ বলেন,

وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشيياطين، فاجتالتهم عن دينهم.

আমি আমার বান্দাদের 'হানিফ' অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠরূপে সৃষ্টি করেছি। এরপর শয়তান তার পিছে লেগে তাকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে নিয়ে যায়।[৫২]

অতএব, 'আবু হানিফা' অর্থ 'হানিফাওয়ালা' বা 'খাটি দীনওয়ালা'। 'হানিফার বাবা' নয়!

যারা জানেন তারা তো জানেনই, যারা জানেন না তারা যাতে বিভ্রান্ত না হন—সে জন্যে। নবিনন্দিনী ফাতিমাতুজ জাহরা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহার জীবদ্দশায় আলি আর দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। ফাতিমার ইনতেকালের পর আরও আটটি বিয়ে করেছিলেন তিনি। সব মিলিয়ে নয় স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন হজরত আলির ১৫ ছেলে এবং ১৮ মেয়ে। এরমধ্যে কারও নামই 'তুরাব' ছিল না।

---

[৫২] *মুসলিম*: ২৮৬৫।

ইমামের ইনতেকাল

'ভাঙব তবু মচকাব না'—ছিল ইমাম আবু হানিফার নীতি। জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তিনি তাঁর নীতিতে অটল ছিলেন। ঐতিহাসিক বিবরণমতে ইমাম সাহেবের মৃত্যু হয় ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে। আব্বাসীয় খলিফা মানসুরের কারাগারে নির্যাতন করে অবশেষে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হয় ইমামকে। এখানেও আমরা ইমাম আবু হানিফার দূরদর্শিতার প্রমাণ পাই।

খলিফা মানসুর ইমাম সাহেবকে রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। উদ্দেশ্য ছিল আবু হানিফার মতো যুগশ্রেষ্ঠ আলিমকে যদি প্রশাসনের বিচারপতি পদে বসিয়ে দিতে পারা যায়, তাহলে শাসনব্যবস্থা নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না। সকল কুকর্মের উপরে পর্দা পড়ে যাবে। আবু হানিফা তার কূটচাল বুঝতে পেরে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, মাফ করবেন আমাকে। আমি নিজেকে এই পদের যোগ্য মনে করছি না।

খলিফা মানসুর বললেন, আমি জানি আপনিই এই পদের জন্য সবচেয়ে বেশি যোগ্য।

ইমাম বলেন, না। আমি যোগ্য না।

এভাবে কয়েকবার কথা চালাচালির পর ইমাম সাহেব বললেন, দেখো, আমি বলছি আমি এই পদের যোগ্য না। এখন আমার কথা হয়তো সত্য, হয়তো মিথ্যা। যদি সত্য হয়, তাহলে তো ঠিকই আছে—আমি এই পদের জন্য যোগ্য না। আর যদি আমি মিথ্যা বলে থাকি, তাহলেও আমি এই পদের জন্য যোগ্য না। কারণ, আমি মিথ্যা বলেছি। একজন মিথ্যাবাদীকে বিচারকের আসনে বসানোর প্রশ্নই আসে না!

ইমাম সাহেবের যুক্তির কাছে মাথা নত করলেও খলিফা মানসুর নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসলো না। গ্রেফতার করা হলো আবু হানিফাকে।

তিনি তবুও মানেন না।

শারীরিক অত্যাচার শুরু হলো, তিনি মত পালটান না।

বাড়তে লাগল অত্যাচারের মাত্রা, তিনি অনড়!

অবশেষে জেলের ভেতরেই বিষ খাইয়ে শহিদ করা হলো ইমামকে। তিনি জীবন দিয়ে বিশ্ববাসীকে এই মেসেজ দিয়ে গেলেন, বাতিলের সঙ্গে আপস নয়। কখনোই, কোনো অবস্থাতেই।[৫৩]

[৫৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৬/৪০২।

বুখারি তুমি কার

কথায় কথায় এরা ইমাম বুখারিকে টেনে আনে; অথচ মূর্খতার কারণে তারা জানে না। আর না হয় তর্কের খাতিরে মানে না ইমাম বুখারি যাঁদের কাছ থেকে হাদিস শিখেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই আবু হানিফার ছাত্র। যাঁদেরকে হাদিস পড়িয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা আবু হানিফার অনুসারী। শুধু তাই নয়। ইমাম বুখারির বাবা শায়খ ইসমাইলও ছিলেন আবু হানিফার অনুগামী।

ইমাম বুখারি একদম ছোটবেলায় বুখারায় পড়ালেখা শুরু করেন আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক এবং মক্কি ইবনে ইবরাহিমের কাছে। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক এবং মক্কি ইবনে ইবরাহিম দুজনেই ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ছিলেন।

মক্কায় গিয়ে হাদিস পড়েন আবদুর রহমান আল-মুকরির কাছে। বসরায় তাঁর উসতাজ ছিলেন আবু আসিম আন নাদিম ও আবদুল্লাহ ইবনে আনসারি। কুফায় গিয়ে উসতাজ হিশেবে গ্রহণ করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুসা এবং আবু নুয়াইমকে। এঁরা সবাই আবু হানিফার ছাত্র।

বাগদাদ গিয়ে হাদিস অধ্যয়ন করেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে। আহমদ ইবনে হাম্বল ইমাম আবু ইউসুফের ছাত্র; আর কাজি আবু ইউসুফ ইমাম আবু হানিফার অন্যতম ছাত্র।

তার মানে, ইমাম বুখারি যাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা নিলেন, দীক্ষিত হলেন যাঁদের পরশে, তাঁরা ইমামে আজম আবু হানিফারই ছাত্র। তাহলে ইমাম আবু হানিফাকে মাইনাস করে বুখারি-বন্ধনায় মশগুল যারা, তারা যে বোকার স্বর্গের চকিদার, এটা কি তাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার না?

বুখারির বাবার কথা বলছিলাম। ইমাম বুখারির বাবা ইসমাইল ছিলেন ইমাম আবু হানিফার অন্যতম অনুসারী। বাবার কথা জানাতে গিয়ে ইমাম বুখারি বলেছেন, 'আমার বাবা মালিক বিন আনাস থেকে হাদিস শুনেছেন, হাম্মাদ বিন জায়েদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের সঙ্গে দু-হাতে মুসাফাহা করেছেন।

উল্লিখিত তিনজনই ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ছিলেন। তার মানে শুধু ইমাম বুখারিই না, বুখারির বাবাও ছিলেন ইমাম আবু হানিফার দিকে ধাবিত।

অতএব, প্রমাণিত হলো ইমাম আবু হানিফার সঙ্গে বুখারির কোনোই সম্পর্ক নেই।

আসলে অন্ধ যদি কানও বন্ধ করে রাখে, তাহলে তাকে বোঝানোর ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কারও আছে কি না আমাদের জানা নেই।

বুখারি ও কুফা

আবু হানিফার জন্মভূমি কুফার প্রতি ইমাম বুখারির একটু বেশিই টান ছিল। বুখারি নিজেই বলেন, আমি সিরিয়াতে এবং মিসরে গিয়েছি চার বার করে। হিজাজে ছিলাম ছয় বছর; আর কুফায় যে কতবার গিয়েছি সেটার কোনো হিসাবই আমার মনে নেই।[৫৪]

কুফার প্রতি ইমাম বুখারির কেন ছিল এই টান

কারণ : ১

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় নিয়েছেন মদিনা থেকে। আবু বকরের খেলাফতের শুরুটাও ছিল তাই মদিনা থেকে। আবু বকরের বিদায় মদিনা থেকে, মদিনা থেকেই উমরের শুরু। উমরের শাহাদাত মদিনায়, উসমানের শুরুটা তাই মদিনা থেকে। উসমানের শাহাদাত মদিনায়, আলির সূচনাও মদিনায়। অর্থাৎ, খলিফার বিদায় যেখানে হয়েছে, পরবর্তী খলিফার সূচনাটাও সেখান থেকেই হয়েছে। খুলাফায়ে রাশেদার পর যখন হাদিস লিপিবদ্ধ করার সময় আসলো, তখন মদিনাতুর-রাসুল থেকে কাউকে কবুল না করে আল্লাহপাক কেন সুদূর কুফা থেকে ইমাম আবু হানিফাকে বাছাই করলেন?

দুনিয়াটাকে আল্লাহপাক একটা নেজামের ভেতর দিয়েই পরিচালনা করেন। বাকিরা সবাই মদিনা থেকে ছিলেন কারণ, পূর্বসূরিরা মদিনা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু চতুর্থ খলিফা সায়্যিদুনা আলি রা. ইনতেকাল করলেন কুফা নগরীতে। সুতরাং লজিস্টিক ধারাবাহিকতার দাবি হচ্ছে, প্রথম ইমাম হবেন কুফা থেকে। হলোও তাই। ইলমে হাদিসের কিংবদন্তিক খেদমতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুফা থেকে তৈরি করে দিলেন নুমান ইবনে সাবিতকে—বিশ্বমুসলিম যাঁকে ইমামে আজম আবু হানিফা নামে জানেন।

---

[৫৪] *ফাতহুল বারি*, ভূমিকা।

কারণ : ২

ধরা যাক, আপনি একটি সংরক্ষিত নগরীতে প্রবেশ করবেন। প্রথম কথা, আপনার পাস থাকতে হবে। উইদাউট পাস আপনি ঢুকতে পারবেন না। পাস সংগ্রহ করতে পারলে তখন আপনার কাজ শহরের সদর দরজা তালাশ করা। দরজা ছাড়া বিকল্প পথে কোনো ভালো মানুষ কারও ঘরে প্রবেশ করে না। সিঁধকাটাদের কথা আলাদা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি ইলমের শহর আর আলি হচ্ছে সেই শহরের দরজা।' এটাই কারণ—খুলাফায়ে রাশেদার পর মক্কা-মদিনা থেকে কেউ সামনে না এসে কুফা থেকে ইমাম আবু হানিফার সামনে আসার। এটাই বিশ্বনবির নির্দেশ—'আমার হাদিসের শহরে প্রবেশ করতে চাও, দরজা দিয়ে প্রবেশ করো; আর এই দরজা কুফাতে, চাবি আবু হানিফার হাতে।'[৫৫]

পছন্দের প্রিয়তা

বুখারি শরিফে হাদিসসংখ্যা ৭,২৭৫টি। আর বর্ণনা হিসাব করলে মোট ৯,০৮২টি হয়।[৫৬] এর মধ্যে ২২টি বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম বুখারি নিজেই বলেন, 'এই ২২ বর্ণনা নিয়ে আমার খুব গর্ব কারণ, এগুলো সুলাসিয়াতের অন্তর্ভুক্ত।'

হাদিসশাস্ত্রে পারদর্শীগণ জানেন মুহাদ্দিস এবং রাসুলের মধ্যে 'মাধ্যম' কম থাকলে মুহাদ্দিস বেশি খুশি হন; আর এই ব্যবধান তিনজন হলে সেটাকে 'সুলাসি' বলা হয়। অর্থাৎ, রাসুল থেকে মাত্র তিনজন বর্ণনাকারীর মাধ্যমেই মুহাদ্দিস হাদিসটি পেয়ে গেছেন।

ইমাম বুখারির গর্ব করা ২২ বর্ণনার মধ্যে ১১টিতে তাঁর উসতাজ আবু হানিফার ছাত্র মক্কি ইবনে ইবরাহিম। ৬টিতে উসতাজ আবু হানিফার ছাত্র আবু আসিম আন নাবিল। ৩টির রাবি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আনসারি, যিনি আবু হানিফার ছাত্র। অপর দুটির মধ্যে একটির বর্ণনাকারী হামমাদ বিন ইয়াহইয়া কুফি এবং অপরটির বর্ণনাকারী ইসাম বিন খালেদ আল হিমসি। ২২টির মধ্যে ২০টির বর্ণনাকারীই আবু হানিফার ছাত্র!

কী বলা যায়?

আজিব ইত্তেফাক?

কাকতালীয় ব্যাপার?

---

[৫৫] *সুনানে তিরমিজি* : ৩৭২৩।

[৫৬] *মুকাদ্দিমায়ে ফাতহুল বারি* : ৬৫৩।

তাহলে ইমাম আবু হানিফাকে পাশ কাটিয়ে যারা বুখারি বুখারি জিগির করেন, সেই অসুস্থদের কি বলা উচিত না; ভালো কোনো মানসিক হসপিটালের হাওলা হতে?

বুখারির সঙ্গে কারা

প্রত্যেক উসতাজেরই কিছু প্রিয় শাগরিদ থাকেন, যাদের নিয়ে উসতাজের গর্বের অন্ত থাকে না। ইমাম বুখারির সরাসরি ছাত্রসংখ্যা ৯০ হাজারের মতো। এর মধ্যে চারজন ছিলেন তাঁর বিশেষ ছাত্র। বুখারি যেদিকে যেতেন, তাঁরাও সঙ্গে থাকতেন। তাঁরা হলেন ইবরাহিম বিন মাকিল, হামমাদ বিন শাকির আন নকফি, মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ খরবরি ও আবু তালহা মানসুর বিন মুহাম্মাদ বাগদাদি।

চারজনই হানাফি মাজহাবের অনুসারী। তার মানে যাঁদের কাছ থেকে বুখারি হাদিস শিখেছেন, তাঁরাও আবু হানিফার অনুসারী। যাঁদের দিয়েছেন তাঁরাও। তাহলে মনে হয় বলাই যায়, বাবা নামধারী আহলে হাদিস! ইমাম বুখারির সঙ্গে তোমাদের কোনো লেনদেন নেই। দয়া করে অন্য রাস্তা ধরো!

বুখারি ও ফাজায়েলে আমাল

আমরা বলি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা-কাজ-সম্মতি তো দলিলই, সাহাবিদের কথা-কাজও আমাদের জন্য দলিল। আহাফিরা মানে না। চলুন দেখি তারা যাঁকে মানে, সেই ইমাম বুখারি এ ব্যাপারে কী বলেন? *সহিহ বুখারি*র কিতাবুন নিকাহর শেষ অধ্যায়—

باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟ وطعن الرجل ابنته فى الخاصرة عند العتاب.

وأخرج فيه حديثا عن عائشة رضى الله عنها، قالت عاتبنى أبو بكر وجعل يطعننى بيده فى خاصرتى، فلا يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذى.

এখানে ইমাম বুখারি মাসআলা বর্ণনা করেছেন দুটি; কিন্তু হাদিস এনেছেন একটির ব্যাপারে। বুখারি বর্ণিত মাসআলা দুটি হলো :

১. কোনো ব্যক্তি কি অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারে, গেল রাতে তুমি কি তোমার স্ত্রীর কাছে (!) গিয়েছিলে?

২. বাবা কি তার কন্যাকে উপদেশ বা শাসন করার জন্য শারীরিকভাবে আঘাত করতে পারেন?

শিরোনামে মাসআলা দুটি। কাউকে তার স্ত্রীর (!) ব্যাপারে প্রশ্ন করা এবং মেয়েকে বাবা কর্তৃক শাসন করা। ইমাম বুখারি শুধু একটি মাসআলার পক্ষে দলিল এনেছেন হাদিস থেকে। তা-ও সেই হাদিস আবার নবির হাদিস নয়, একজন সাহাবিয়ার—উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশার হাদিস। আম্মি আয়েশা বলেন, '(আমার বাবা) আবু বকর আমাকে উপদেশ দিতে গিয়ে আমার কোমরে আঘাত করলেন। তখন নবিজির মাথা মুবারক ছিল আমার উরুতে (নবি ঘুমোচ্ছিলেন)। আঘাতপ্রাপ্ত হয়েও আমি নড়াচড়া করলাম না (কারণ, নবির ঘুম ভেঙে যাবে)।'[৫৭]

যে ব্যাপারগুলো আলোচনায় আসতে পারে

১. ইমাম বুখারি স্বতন্ত্র দুটি বিষয়ে শিরোনাম ঠিক করলেন, তাহলে তো উচিত ছিল দুটির ব্যাপারেই দলিল পেশ করবেন। একটির পক্ষে দলিল আনলেন, অন্যটির জন্য না কেন?

২. এ ব্যাপারে কি নবি থেকে কোনো হাদিস ছিল না? সাহাবির হাদিস দিয়ে দলিল দিলেন কেন?

৩. যে মাসআলাটিকে ইমাম বুখারি দলিল ছাড়াই রেখে দিয়েছেন, সেই দলিলটি কোথায় আছে?

প্রথম পয়েন্ট

ইমাম বুখারি বিষয় সামনে আনলেন দুটি। দলিল দিলেন একটির ব্যাপারে। আহাফিদের দাবি, প্রতিটি মাসআলায় কুরআন-হাদিস থেকে দলিল থাকা লাগবে, না হলে মানা যাবে না। হানাফি তথা মাজহাবওয়ালাদের কথা, প্রত্যেক ব্যাপারে কুরআন-হাদিসেই দলিল থাকতে হবে—এমন কোনো কথা নেই। ইমাম বুখারিও হানাফিদের মতোই ভাবতেন? তিনিও মনে করতেন না সব বিষয়ে হাদিস থেকেই দলিল আনতে হবে।

দ্বিতীয় পয়েন্ট

ইমাম বুখারি এ বিষয়ে নবি থেকে দলিল না এনে একজন সাহাবিয়ার (আয়েশার) উক্তি দিয়ে দলিল দিয়ে এ কথাই বুঝিয়ে দিলেন যে, নবির কথা-কাজ তো দলিলই, সাহাবিদের

---

[৫৭] *সহিহ বুখারি : ৫২৫০।*

কথা-কাজও দলিল হয়; ঠিক যেমনটি আমরা বলে থাকি। তাহলে বুখারি কার? আহলে হাদিসের? নাকি আমাদের? তাদের সঙ্গে ইমাম বুখারির যে মোটেও সম্পর্ক নেই, সেটা নিয়ে কি আর লম্বা-চওড়া আলোচনার দরকার আছে?

তৃতীয় পয়েন্ট

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি স্বতন্ত্র দুটি বিষয় উপস্থাপন করে একটির পক্ষে হাদিস এনেছেন। অন্যটির ব্যাপারে কি হাদিস নেই? থাকলে সেটা কোথায় পাওয়া যাবে?

সহজ-সরল জবাব, তাবলিগওয়ালাদের *ফাজায়েলে আমালে*। বিশ্বাস করা কঠিন, তাই না? ইমাম বুখারি মাসআলা বয়ান করছেন *বুখারিতে* আর *বুখারির* মাসআলার দলিল মিলছে গিয়ে *ফাজায়েলে আমালে*। আহারে তাবলিগি ভাইয়েরা। তাদের কাছে কী আছে তারা নিজেরাই জা. ন না।

সাহাবির ছেলে অসুস্থ। তিনি গেছেন সফরে। ইতিমধ্যে ছেলেটি মারা গেল। মা ছেলেকে চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে দিলেন। রাতে স্বামী ঘরে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ছেলের এখন কী অবস্থা? সে এখন কেমন আছে?

স্ত্রী বললেন, এখন ভালো। আরামের অবস্থায় আছে।

সাহাবি আশ্বস্থ হলেন। স্ত্রী খুবই স্বাভাবিক আচরণ করলেন স্বামীর সঙ্গে; অন্যদিনের মতো, যেন কিছুই হয়নি। অথচ ছেলের লাশ পড়ে আছে ঘরে! রাতে বিছানায়ও (!) গেলেন স্বামীর সঙ্গে। সকালবেলা স্বামীকে বললেন, আচ্ছা, আমাকে একটি প্রশ্নের জবাব দিন তো।

—কী প্রশ্ন?

—আপনার কাছে যদি কেউ কিছু আমানত রাখে আর এক সময় সে তার রাখা আমানত ফিরিয়ে নেয়, আপনি কি মন খারাপ করবেন?

সাহাবি বললেন, অবশ্যই না। মন খারাপ করার কী আছে!

স্ত্রী তখন বললেন, আপনার কাছে থাকা আল্লাহর আমানত আল্লাহপাক গতকাল ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন।

—মানে কী?

—আমাদের ছেলেটি গতকাল মারা গেছে!

চমকে উঠলেন বাবা! কী বলো এসব? এতবড় ঘটনা, আমার ছেলে মারা গেছে রাতে

আর তুমি আমাকে এখন বলছ?

স্ত্রী বললেন, আপনি সফর করে এসেছেন। আপনার শারীরিক ও মানসিক আরামের দরকার ছিল। আপনি ক্লান্ত ছিলেন। আপনার ঘুমের দরকার ছিল। আমি চাইনি আপনার আরামের ব্যাঘাত ঘটুক। যা হবার, তাতো হয়েই গেছে। আল্লাহর ইচ্ছা।

সাহাবি ছুটে গেলেন নবির দরবারে। 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! গতকাল আমার স্ত্রী তো আমাকে অবাক করে দিয়েছে। কোনো মা এতবড় কুরবানি দিতে পারে, আমি ভাবতেই পারছি না!'

নবি জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? সাহাবি ঘটনা খুলে বললেন। শুনে বিশ্বনবি জিজ্ঞেস করলেন, *হাল আরাজতুমুল-লাইলাতা?* 'তুমি কি রাতে তোমার স্ত্রীর কাছে (!) গিয়েছিলে...?'[৫৮]

ঠিক এই মাসআলাটিই ইমাম বুখারি *সহিহ বুখারি*তে বলেছেন। কোনো ব্যক্তি কি অন্য কাউকে এভাবে জিজ্ঞেস করতে পারে, 'তুমি গত রাতে তোমার স্ত্রীর কাছে গিয়েছিলে কি না?' মাসআলা বলেন বুখারি; আর দলিল দেন ইমাম জাকারিয়া রাহ. তাঁর *ফাজায়েলে আমালে* । *ফাজায়েলে আমাল* নাম শুনলেই যাদের শরীরে জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে যায়, তাদের জন্য এটি বিরাট একটি দুঃসংবাদ। কিচ্ছু করার নেই।

যা হোক, আল্লাহর রাস্তায় দেওয়া কুরবানি কখনো বৃথা যায় না। শায়খুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া লিখেছেন, ওই নারী-সাহাবির এতবড় কুরবানিও বেকার যায়নি। ছেলের লাশ ঘরে রেখে স্বামীর সঙ্গে বিছানায় কাটানো ওই রাতেই তিনি নতুন করে সন্তানসম্ভবা হন। যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন তিনি। সেই ছেলে বড় হলে তার ঔরসে ১০টি ছেলের জন্ম হয়; আর বড় হয়ে ১০জনই বড় বড় আলিম হয়েছিল।

বাবার মেয়ে

ইমাম বুখারি উত্থাপিত বিষয় দুটি, (যার একটির পক্ষে হাদিস তিনি নিজেই উল্লেখ করে গেছেন; আর অন্যটির পক্ষে দলিল দিয়েছেন শায়খ জাকারিয়া, তাঁর *ফাজায়েলে আমালে*)। দুটির পক্ষেই রিলেটেড হাদিস দুটি দুজন মহিলার। উভয়টিতেই স্বামীর জন্য স্ত্রীর ত্যাগ স্বীকারের বার্তা। একটিতে স্ত্রী তার স্বামীর ঘুম এবং আরাম নষ্ট হবে বলে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাত কাটিয়ে দেন। অন্যটিতে আম্মাজান আয়েশা বাবার দেওয়া আঘাত নীরবে হজম করে বসে থাকেন। কারণ, নবির ঘুম নষ্ট হবে, আরামের ব্যাঘাত ঘটবে। অবশ্য আয়েশা এমন হবেন; এটা অবাক হওয়ার বিষয় না। দেখতে হবে না কোন বাবার কন্যা!

---

[৫৮] *ফাজায়েলে আমাল, হেকায়াতে সাহাবাহ* (বাংলা) : ১৮৩।)

এক রাতে (হিজরতের রাত) আবু বকরের উরুতে নবির মাথা। শুয়ে আছেন নবি। গর্তের মুখে আবু বকরের পায়ের গোড়ালি। ভেতর থেকে বিষধর সাপ ছোবলের পর ছোবল দিয়ে যাচ্ছে। ব্যথায় কুঁকড়ে উঠছেন আবু বকর কিন্তু নড়াচড়া করছেন না। নবির আরামের ঘুম ভেঙে যাবে বলে!

আরেক রাতে (যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে, তাবুতে) আয়েশার উরুতে মাথা রেখে শুয়ে আছেন নবি। বাবা আঘাত করছেন। আয়েশা নড়ছেন না। কারণ, নবির আরামের ঘুম ভেঙে যাবে! বাবা সিদ্দিক আর মেয়ে সিদ্দিকা কি আর এমনি এমনি হয়ে গিয়েছিলেন নাকি! সালাম তোমাকে বাবা! সালাম তোমাকে বাবার মেয়ে।

সহিহ হাদিস কাকে বলে

সাধারণ মুসলমানদের মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়ার জন্য বলি। হাদিসশাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী হাদিসের পরিভাষায় হাদিস আছে অনেক রকমের। সহিহ হাদিস, হাসান হাদিস, জয়িফ হাদিস, মুতাওয়াতির হাদিস, মাশহুর হাদিস, মারফু হাদিস, মাওকুফ হাদিস, নাসিখ হাদিস, মানসুখ হাদিস, রাজেহ হাদিস, মারজুহ হাদিস, মাওজু হাদিস ইত্যাদি। এগুলো কোনটা কী—না জেনে খালি 'ছহি হাদিছ ছহি হাদিছ' বলে মুখে ফেনা তুললে তো হবে না। প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় এখানে শুধু সহিহ হাদিসের সাইট নিয়েই কথা বলছি।

নবি থেকে আমরা পর্যন্ত হাদিস এসে পৌঁছার মাধ্যমকে হাদিসের পরিভাষায় বলা হয় 'সনদ'। রাসুল বলেছেন, সাহাবিরা শুনেছেন। সাহাবিরা বলেছেন, তাদের ছাত্ররা শুনেছেন...এভাবে বর্ণনা ধারাবাহিকতায় আমরা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, যারা হাদিস বহন ও বর্ণনা করেছেন, তাঁদের সকলের যোগ্যতা সমান ছিল না। কারও কম ছিল কারও বেশি। হাদিসশাস্ত্রের নীতি নির্ধারকগণ এই বর্ণনাকারীদেরকে তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।

১. সর্বোত্তম যোগ্যতাসম্পন্ন বর্ণনাকারী।

২. মধ্যম যোগ্যতাসম্পন্ন বর্ণনাকারী এবং

৩. নিম্ন যোগ্যতাসম্পন্ন বর্ণনাকারী।

আর বর্ণনাকারীদের যোগ্যতার ব্যাপারটি সামনে রেখে মুহাদ্দিসগণ শুদ্ধ হাদিসকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণির বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদিসকে ইলমে হাদিসের পরিভাষায় বলা হয় 'সহিহ হাদিস'। দ্বিতীয় শ্রেণির বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদিসকে বলা হয় 'হাসান হাদিস' এবং তৃতীয় শ্রেণির বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদিসকে বলা হয় 'জয়িফ' বা 'দুর্বল হাদিস'। আর সহিহ-হাসান-জয়িফ; শুদ্ধ অর্থে তিনটিই সহিহ হাদিসের অন্তর্ভুক্ত।

আহাফিরা মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার সুযোগটা পেয়েছে সহিহ হাদিসের সবদিক মানুষের

সামনে উন্মুক্ত না থাকায়। সহিহ হাদিসের সহিহ সংজ্ঞা সঠিকভাবে প্রচার করা গেলে তারা হাদিসের সনদ নিয়ে উলটা-পালটা কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারত না। একটি হাদিস শুধু সনদের কারণেই তো সহিহ-জয়িফ হয় না, দুর্বল সনদের হাদিসও আরও অনেকগুলো কারণে সহিহ হয়ে যায়। উসুলে হাদিস বলছে—

১. হাদিসের সনদ শক্তিশালী হলে সেই হাদিস সহিহ।

২. একই হাদিস কয়েক সনদে আসলে সেটাও সহিহ।

৩. কোনো হাদিস দ্বারা মুজতাহিদগণ ইসতেদলাল করলে সেটাও সহিহ।

৪. হাদিসের অর্থের মধ্যে ইজমা হয়ে গেলে সেই হাদিসও সহিহ হাদিসের ক্যাটাগরিতে।

৫. হাদিসের মাজমুন বা ভাবার্থ সহিহ হলে সেই হাদিসও সহিহ হাদিসের দরজায় থাকে।

উম্মতকে এসব না বুঝিয়ে শুধু সনদ সনদ জিকির করার ফলে আজ অবস্থা এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, যেকোনো হাদিস সামনে নিয়ে আসা হলেই তারা যে কারও একজনের কিতাব একটা বের করে বলে, দেখো এই হাদিসের মধ্যে জনৈক বর্ণনাকারী সম্পর্কে অমুক মুহাদ্দিস বলছেন, 'সে লোক ভালো ছিল না। তার বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে না।' আরে বাবা! তুমি যাঁদের কথা বলছ; যাঁরা হাদিস বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে কথা বলেছেন, তাঁরা কি কেউ নবি ছিলেন নাকি? তাঁদের ওপর কি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নাজিল হতো? জিবরাইল এসে তাঁদের জানিয়ে দিয়ে যেতেন অমুক হাদিসে তমুক বর্ণনাকারী মন্দ লোক? তাঁরাও তো তাঁদের সূত্রে খোঁজ-খবর নিয়ে কথা বলেছেন। কী গ্যারান্টি আছে তাঁদের অনুসন্ধানের সূত্রগুলো সকল ক্ষেত্রে সঠিক ছিল? তাঁরাও তো মানুষ ছিলেন, ভুল তো তাঁদেরও হতে পারে—এ কথা ভুলে গেলে তো ভুল হবে।

নবির নামাজ

প্রথমেই বলে নিই; নামাজে হাত বাঁধা, সুরা ফাতিহা পড়া, 'আমিন' বলা, রাফে-ইয়াদাইন করা, এসব মাসআলায় মাজহাবের ইমামগণের মধ্যে ইখতিলাফের মূল কারণ হলো মাসআলাগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাদিসে ইখতিলাফ বা ভিন্নতা। আর এটা হয়েছে মূলত সাহাবিগণের হিজরতের কারণে। দেখা গেছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদিস বলেছেন—সাহাবিগণ সেটা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন স্থানে স্থানে। কেউ বসরায়, কেউ কুফায় কেউ মিসরে; কিন্তু কিছুদিন পরে রাসুল যে পূর্বের দেওয়া বিধান পরিবর্তন করে নতুন বিধান দিয়েছেন, সেই খবর ওই সাহাবিদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়নি। তখন তো আর এখনকার মতো যোগাযোগব্যবস্থা ছিল না। এক দেশ থেকে অন্য দেশে একটি সংবাদ পৌঁছাতে দুই/তিনমাস লেগে যেত। নামাজের যে মাসআলাগুলোতে ইমামগণের মধ্যে ইখতিলাফ হয়েছে, এটার মূল কারণ হলো এই।

ইমামে আজম আবু হানিফা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিসগুলোকেই আমলে নিয়েছেন বেশি। এর কারণ, ইবনে মাসউদ সবসময় রাসুলের পাশেপাশে থাকতেন; ঘরের ছেলের মতো। হুজুরের জীবদ্দশায় ইবনে মাসউদ মদিনা ছাড়েন নি। নবিজি ইবনে মাসউদকে পারমিশন পর্যন্ত দিয়ে রেখেছিলেন যে, 'আমার কোনো স্ত্রী যদি কাছে না থাকেন, তাহলে তুমি আমার বেডরুমে পারমিশন ছাড়াই ঢুকতে পারো, তোমাকে এই পারমিশন দিয়ে রাখলাম।' ইবনে মাসউদ সম্পর্কে নবি ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'আমার আবদুল্লাহ কিছু বললে অবশ্যই সঠিক বলবে।'

সেই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হুজুরের ইনতেকালের পরে আবু হানিফার জন্মভূমি কুফায় চলে গিয়েছিলেন। কুফা ছিল ইবনে মাসউদময়। সমস্ত কুফা জুড়েই বিস্তৃত ছিল আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ইলম। সেই ইলিমের আলোয় আলোকিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন ইমাম আবু হানিফা। আর এ কারণে আবু হানিফার সুযোগ হয়েছিল হুজুরের শেষ আমলগুলো সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার। হানাফি মাজহাব সেভাবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এখানে দুটি বিষয়ে কয়েক লাইন কথা বলতে ইচ্ছে করছে :

এক. হাদিসের ভিন্নতায় কারণ কী?

দুই. ইমামগণের ইখতিলাফ বলার কারণ কী?

হাদিসের ভিন্নতার কারণ

দেখা যায় বিভিন্ন শরয়ি মাসআলায় আল্লাহর নবি থেকে পরস্পর-বিরোধী হাদিস বিদ্যমান। কারণ, আগেই বলা হয়েছে অবস্থা ও অবস্থানের প্রেক্ষিতে নবি একটি হুকুম দিয়েছিলেন; পরে সেটি ফিরিয়ে নিয়েছেন। যেমন, এক হাদিসে নবিজি বলেন,

كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروا القبور، فإنها تزهد فى الدنيا وتذكر الأخرة.

আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন আমি বলছি, তোমরা কবর জিয়ারত করতে পারো।[৫৯]

বোঝাই যাচ্ছে পূর্বের কোনো নির্দেশনায় কবর জিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল।

ইমামগণের ইখতিলাফ

লক্ষ করে থাকবেন, আমি বার বার উল্লেখ করেছি হাদিসের ভিন্নতার কারণে ইমামগণের মধ্যে বিভিন্ন মাসআলায় ইখতিলাফ হয়েছে। তার মানে আমরা নামাজে 'আমিন' আস্তে বলি—আমরা ঠিকাছি। শাফিয়ি মাজহাবের অনুসারীগণ জোরে বলেন—তাঁরাও ঠিকাছেন। আমরা রাফে-ইয়াদাইন করি না, তারা করেন—উভয়েই সঠিক। এখন প্রশ্ন হলো, এই কাজ তো গায়রে মুকাল্লিদ বা লা-মাজহাবি আহাফিরাও করে থাকেন। তাহলে তাদের বেলায় কঠোরতা কেন? তাদের সঙ্গে কেন ইখতিলাফ?

জবাব হলো, প্রথমত আহলে হাদিসের সঙ্গে আমরা ইখতিলাফ করি না। তারাই আমাদের সঙ্গে ইখতিলাফ করে। যারা আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত, ইখতিলাফ তাঁরা করে না। ইখতিলাফ করে পরে যারা এসেছে তারা। এই কথাটি বুঝলে আমজনতার আরেকটি কমন প্রশ্নেরও জবাব মিলে যায়। অনেকেই বলেন, 'সবাই আলিম; কিন্তু কেউ বলেন এটা ঠিক, কেউ বলেন ওটা ঠিক। আলিম-আলিম ঝগড়া করে আমাদের ফেলেছেন সমস্যায়! আমরা এখন যাব কোনদিকে?'

এক লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় আক্রান্ত হলো সে। ছিনতাইকারী তার হাত থেকে মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিতে চায়। মানুষটি প্রাণপণে চেষ্টা করছে তার ফোন রক্ষা

[৫৯] *ইবনে মাজাহ* : ১১২।

করতে। দুজনে চলছে ধস্তাধস্তি। এই অবস্থা দেখে কেউ যদি বলে, দুজন লোক ঝগড়া করে অশান্তি সৃষ্টি করছে, তাহলে হয় সে প্রকৃত অবস্থা জানে না; আর না হয় সে বেকুব কিসিমের লোক।

আহলে হাদিস ফিরকা আমাদের কাছ থেকে আমাদের ইমান ছিনিয়ে নিতে চায়। আমরা কি আমাদের এই সম্পদ রক্ষার চেষ্টা করব না?

শাফিয়ি মাজহাবিগণ 'আমিন' জোরে বললে ঠিক, আহাফিরা করলে ভুল কেন? রাফে-ইয়াদাইন অন্য মাজহাবের লোক করলে ঠিক, আহাফিরা করলে অঠিক কেন?

কারণ—

ভিন্নধর্মী হাদিসের আলোকে যখন কোনো আমলে ভিন্নতা দেখা দেয়, তখন মুজতাহিদ ইমাম ইজতেহাদ করে একটার ওপর আমল করার নির্দেশ দেন। হতে পারে দুই বিধানের একটি ভুল ছিল অন্যটি শুদ্ধ ছিল। কোনটি প্রকৃতপক্ষে সঠিক, সেটা তো আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। হতে পারে তিনি ভুল সিদ্ধান্তই দিয়েছেন; কিন্তু যেহেতু তিনি মুজতাহিদ হিশেবে ইজতেহাদ করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তাই তিনি ভুল করলেও, তাঁর অনুসারীগণ ভুলের ওপর আমল করলেও সওয়াব পাবেন। দলিল তো আগেই উল্লেখ করা আছে।

অন্যদিকে আহলে হাদিস যারা, যারা মাজহাবের অনুসারী না হয়ে নিজে নিজে হাদিসে আমল করার দাবি করে, তারা কীভাবে নিশ্চিত হবে তাদের আমল করা হাদিসই শতভাগ সঠিক? এই অবস্থায় তারা যদি ভুল করে, তাহলে তো ভুলই। এমনকি চিন্তাভাবনা করে যদি সঠিক হাদিসেও আমল করে, তবুও তারা ভুল করল। কারণ, হাদিস যাচাই করার অথরিটি তাদের ছিল না। তারা ফাও আইডিয়ার ওপর মেরে দিয়েছে। মারাত্মক এক্সিডেন্ট হতে পারত। তাদের জন্য এই ঝুঁকি নেওয়ার অনুমতি ইসলাম দেয়নি।

আহাফিদের অপপ্রচার

আহাফি ফিতনার প্রধান টার্গেট নামাজ। নামাজ হলো মুসলমানের প্রধান ইবাদত। নামাজে গণ্ডগোল লাগিয়ে দিতে পারলে আর কিছু না করলেও চলে। ইদানীং সাধারণ মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি ফেইস করছে যে ব্যাপারটি, সেটি হলো নামাজ নিয়ে নব্য-নামাজিদের বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার। পৃথিবীর ৮০% মুসলমান হানাফি মাজহাব অনুসরণ করে নামাজ আদায় করে। সদ্য গজিয়ে ওঠা ইউটিউব মৌলোবিরা ঘরের দরজা-জানালা-ভেন্টিলেটর বন্ধ করে ফতোয়াবাজি করে যাচ্ছেন—

- নামাজে নিয়ত করা বিদআত!
- বুকের উপর হাত না বাঁধলে নামাজ শুদ্ধ হবে না!

- ইমামের পেছনে সবাইকে সুরা ফাতিহা পড়তেই হবে।
- নামাজের মধ্যে 'আমিন' চিল্লায়া বলতে হবে! তা না হলে হবে না!
- রুকুতে যেতে-উঠতে, সিজদা থেকে উঠে আবার নিয়তের মতো করে হাত উঠাতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কেউ যদি ভাবেন, তারা তো এখন প্রকাশ্যে কথা বলছেন। তাহলে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে বললাম কেন?

কারণ হলো, এরা কথা বলে তাদের আঙিনায়। মুখোমুখি হতে ভয় পায় এরা। হানাফি আলিমগণের পক্ষ থেকে বার বার করে যখন আহ্বান করা হয়—আসুন, আমাদের সঙ্গে সরাসরি বসুন; অথবা আমাদেরকে আপনাদের সঙ্গে বসতে দিন। কিতাব বের করুন। প্রমাণ করুন আমরা ভুল! খামাখা মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন কেন?

তারা আসে না! তারা এসে বসে না! বসলে তো থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়বে। তখন আর হামকে-তুমকে করতে পারবে না!

যা হোক, তাদের কথায় কান দিয়ে লাভ নেই। আমরা যারা হানাফি মাজহাব অনুসরণ করে দীন পালন করি, আমরা যারা সাধারণ মুসলমান, আমাদের জন্য শুধু এটুকুনই যথেষ্ট যে, আমরা কুরআন-হাদিসের ভিত্তিতে নামাজ আদায় করছি।

নিয়ত

নামাজ পড়া ফরজ। ফরজ নামাজের জন্য নিয়তও ফরজ। মুখে উচ্চারণ করলেন কি মনে মনে করলেন—কিছু যায় আসে না। তবে নিয়ত লাগবেই। তাদের অনেকেই 'নামাজে নিয়ত লাগে না' বলে বিভ্রান্তি ছড়ায়। (অবশ্য আলিমগণের সামনে পড়লে কথা একটু ঘুরিয়ে নেয়। বলে, আমরা তো 'নিয়ত লাগে না' বলি না। আমরা বলি, 'মুখে উচ্চারণ করা লাগে না'। যখন বলা হয়—আচ্ছা, তা মুখে উচ্চারণ করাই লাগবে—কারা বলে? তখন আর কিছু বলে না।)

তারা নিজেদের আবার হাদিসওয়ালা বলে। ইমাম বুখারির নাম নিতে নিতে মুখে ফেনা তুলে ফেলে। কতবড় ধাপ্পাবাজি! অথচ *সহিহ বুখারির* এক নম্বর হাদিসটিই হলো নিয়তের ব্যাপারে।

عن عمر رضى الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لامرئ ما نوى.

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত নবিজির এই হাদিসটি প্রায় মুসলমানেরই মুখস্থ—'ইন্নামাল আমালু বিন-নিয়্যাত। প্রত্যেক আমল নিয়তের ওপর নির্ভর করে। যে যেভাবে নিয়ত করবে, প্রতিদান সেভাবেই পাবে।'[৬০]

নির্ভরশীলতার মানে কী?

মানে হতে পারে দুইটা। আমল শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত জরুরি; অথবা আমলের বিনিময়ে সওয়াব পাবার জন্য। এর বাইরে আর কোনো অর্থ হয় না। যদি শুদ্ধ অর্থে ধরা যায়, তাহলে তো নামাজ শুদ্ধই হবে না নিয়ত ছাড়া। আর যদি বলা হয় আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল; মানে সওয়াবের জন্য নিয়ত লাগবে, তাহলে আমরা বলি, বাবা তোমরা নামাজ পড়ো আমরাও পড়ি। নামাজের বিনিময়ে তোমাদের যদি সওয়াব না লাগে, না লাগুক; আমাদের লাগবে। তাই আমরা নিয়ত করি। তোমাদের যা খুশি তোমরা করো। খালি মানুষকে বুখারি বুখারি বলে ধোঁকা দিয়ো না।

হাত বাঁধা

নামাজে দাঁড়িয়ে তাকবিরে তাহরিমার পর আমরা পুরুষরা হাত বাঁধি নাভির নিচে। আমরা আমাদের মা-খালাদের হাত বাঁধতে বলি বুকের ওপর। দলিল—

> عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله فى الصلاة تحت السرة.
>
> আলকামা ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর তাঁর পিতা থেকে; অর্থাৎ, ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণনা করেন, ওয়াইল ইবনে হুজর বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাজে ডানহাত বামহাতের উপর রেখে নাভির নিচে বাঁধতে দেখেছি।'[৬১]

এই হাদিসকে হাদিস বিশেষজ্ঞদের সবাই সহিহ হাদিস হিশেবে স্বীকার করেন। ব্যস, আমাদের আর বিভ্রান্ত হওয়ার দরকার নেই। আমরা নাভির নিচে হাত বাঁধছি এবং সঠিকভাবেই বাঁধছি। যারা বুকের উপর বাঁধছেন, তারা যে হাদিসের ওপর নির্ভর করছেন—সেটা কোন জমানার হাদিস। তার পরের যুগের হাদিসগুলোতে নবিজির আমল কী ছিল—এটা যদি তারা জানতে না চান, মানতে না চান—না মানুন। এটা তাদের সমস্যা, আমাদের না।

---

[৬০] *সহিহ বুখারি* : ১।

[৬১] *মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা* : ৩৯৫৯।

দাঁড়ানো

নামাজ শুধু একটি ইবাদতই নয়, মুসলিম সমাজের জন্য ডিসিপ্লিন শিক্ষাও। বিশেষত জামাআতে নামাজের বেলায় ব্যাপারটি পরিষ্কার বোঝা যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে সুশৃঙ্খল বাহিনী বলতে মানুষ যাদের বোঝে, সেই সেনাবাহিনীও এত ওয়েল ডিসিপ্লিনড না। আমরা নামাজে দাঁড়াই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে। হাদিস-কিতাব খোঁজার আগে নিজের বিবেককে প্রশ্ন করলেই তো জবাব মিলে আল্লাহর সামনে বেআদবের মতো দাঁড়াব, না আদবের সঙ্গে।[৬২]

عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أقيموا صفوفكم، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدى
إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان.

নামাজে কাতার সোজা করে দাঁড়ানো ওয়াজিব; *বুখারি-মুসলিমের* হাদিসসহ অসংখ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আবু দাউদের হাদিসে কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে এবং দুজনের মধ্যখানের ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়ানোর কথা বলা আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'নামাজে কাতার সোজা করে দাঁড়াও, কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে। অর্থাৎ, কাঁধ বরাবর সমান করে এবং মধ্যখানের ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়াও। তুমি তোমার অপর ভাইদের প্রতি নরম হও আর শয়তানের জন্য জায়গা রেখো না।'

কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে। এর মানে এই না যে, পাশাপাশি দুজনের কাঁধের উচ্চতা সমান হতে হবে। কেউ আছেন লম্বা কেউ খাটো। কাঁধ মিলানোর অর্থ কাতার সোজা রাখা এবং গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে দাঁড়ানো; আর দুজনের মধ্যখানে খালি জায়গা রাখা যাবে না। কারণ, জায়গা খালি পেলেই শয়তান সেখানে এসে ঢুকে পড়বে। হাদিসে একটি বাক্য ولينوا بأيدى إخوانكم 'ভাইদের প্রতি নরম হও' এই কথাটির মানে কী?

এখানেই বিশ্বনবির দূরদর্শিতার প্রমাণ মিলে। আজকাল দেখা যায় কিছু লোক মসজিদে এসে নামাজে দাঁড়িয়েছে এক পা উত্তর আমেরিকায় এবং আরেক পা দক্ষিণ আমেরিকায় দিয়ে। পাশে দাঁড়ানো আরেক নামাজির পা ধাক্কাচ্ছে, পায়ের উপর পা তুলে দিচ্ছে! রাসুল দেড় হাজার বছর আগেই সাবধান করে দিয়ে গেলেন, বাবা মাফ কর, নামাজ পড়তে এসেছিস নামাজ পড়। নিজে শান্তিতে পড়, তোর পাশে দাঁড়ানো আমার অপর

---

[৬২] *সুনানে আবু দাউদ* : ৯৭।

উম্মতটির প্রতিও একটু দয়া কর। তাকে কষ্টটা দিস না। পা দিয়ে আর ঠেলাঠেলিটা করিস না।

তা ছাড়া সামান্য বিবেকটুকু খাটালেও তো কেউ এটা করতে পারে না। কেউ হোয়াইট হাউজে ইনভাইটেড হলো অথবা যাওয়ার সুযোগ পেলো; আর গিয়ে দাঁড়ালো দুই পা দুইদিকে ছড়িয়ে। প্রেসিডেন্ট কিছু বলার আগেই সিকিউরিটি স্টাফ এসে বলবে, এই ব্যাটা উজবুক, সুন্দর করে দাঁড়া; অথচ দাঁড়ানো হচ্ছে নামাজে। দাঁড়াচ্ছে আহকামুল হাকিমিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে, 'হু-কেয়ারস' স্টাইলে! বেআদবিরও তো একটা সীমা থাকা উচিত ছিল।

'আমিন' বলা

নামাজে সুরা ফাতিহা পড়ার পর আমরা 'আমিন' আস্তে বলি। আস্তে মানে নিম্ন আওয়াজে। এভাবে বলাটাই অধিক নির্ভরযোগ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কারও কথায় বিভ্রান্ত হওয়ার কোনোই দরকার নেই। *সহিহ তিরমিজি*তে ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত হাদিস—

عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآ لِّيْنَ فقال أمين، وخفض بها صوته.

ওয়াইল ইবনে হুজর জানান, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়লেন, তিনি 'غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآ لِّيْنَ' বলার পর নিম্ন আওয়াজে 'আমিন' বললেন।[৬৩]

عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال أمين، وأخفى بها صوته،

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে নামাজ আদায় করেছি। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآ لِّيْنَ বললেন, তখন অনুচ্চস্বরে 'আমিন' বললেন।[৬৪]

أخرج ابو داود واللفظ له والترمذى وحسنه، عن سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر،

---

[৬৩] *সুনানে তিরমিজি* : ১/৬৩।

[৬৪] *মুস্তাদরাকে হাকিম* : ২/২৩২; *দারকুতনি* : ১/২৬৩।

وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولاالضالين، فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين، فكتبا فى ذلك إلى أبى بن كعب، فكان فى كتابه إليهما أو فى رده عليهما أن سمرة قد حفظ.

সামুরা ইবনে জুনদুব রা. বলেন, আমি স্মরণ রেখেছি—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি স্থানে সাকতাহ করতেন; অর্থাৎ, চুপ থাকতেন। একটি 'তাকবিরে তাহরিমা' বলার পর দ্বিতীয়টি غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآ لِّيْنَ তিলাওয়াত করার পর। হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন কথাটি গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। তখন উভয়ে এই মাসআলা জানার জন্য উবাই ইবনে কাআব রা.-এর কাছে চিঠি লিখলেন। উবাই ইবনে কাআব উত্তরে জানালেন, 'সামুরা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিষয়টি ঠিকভাবেই স্মরণ রেখেছেন।'[৬৫]

সাকতাহ মানে হচ্ছে, কিছুসময়ের জন্য নিঃশ্বাস জারি রেখে আওয়াজ বন্ধ করে রাখা; অর্থাৎ, চুপ থাকা। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যাক ৩০ পারা কুরআনে চার স্থানে সাকতাহ করা ওয়াজিব। স্থানগুলো হচ্ছে :

১. সুরা কাহাফ, আয়াত : ০১, عواجاسكتة قيما
২. সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ৫২, من مرقدناسكتةهذا
৩. সুরা কিয়ামাহ, আয়াত : ১৪, وقيل منسكتة راق
৪. সুরা মুতাফফিফিন, আয়াত : ১৪, كلا بلسكتةران

হাদিস শরিফে সাকতার কথা বলা হয়েছে। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজে দুই স্থানে—'তাকবিরে তাহরিমা'র পরে একবার এবং 'ওয়ালাজ-জোয়াল্লিন' বলার পরে আরেকবার সাকতাহ করতেন মর্মে আমরা উপরের হাদিস থেকে নিশ্চিত হলাম। নবিজি কী করতেন তখন? চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন নাকি কিছু পড়তেনও?

বিভিন্ন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তাকবিরে তাহরিমার পর 'সানা', মানে 'সুবহানাকা' পড়তে হয়। সুতরাং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন 'সুবহানাকা'ই পড়তেন—বলাই বাহুল্য। সুরা ফাতিহা শেষ করার পর (কিরাআত শুরু করার আগে) 'আমিন' বলা ছাড়া আর কোনো দুআ-দুরুদ সাবিত নেই। সুতরাং নিশ্চিত করেই বলা যায় হুজুর তখন 'আমিন'ই বলতেন। আর সেটা সেভাবেই অনুচ্চস্বরেই পড়তেন, যেভাবে অনুচ্চস্বরে পড়তেন 'সুবহানাকা'।

---

[৬৫] *সুনানে আবু দাউদ* : ১/১১৩; *সুনানে তিরমিজি* : ১/৫৯।)

সুতরাং 'আমিন' অনুচ্চস্বরে বলাই সর্বোত্তম। আস্তে বলাই নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিগণের আমল ছিল। আমরা তাই করি। ইমামে আজম আবু হানিফার মাজহাব অনুযায়ী সকল নামাজে 'আমিন' আস্তে বলা সুন্নাত। আমরা আস্তে 'আমিন' বলি। আহলে হাদিস দাবিদাররা বলেন, মাগরিব এশা ও ফজরে জোরে বলতে হবে; আর জুহর-আসরে বা একা নামাজ পড়লে আস্তে। আসুন তাহলে আরেকটু ডিটেইলে যাই।

'আমিন' আসলে কী

প্রথম কথা হলো, 'আমিন' শব্দটি আসলে কী? এটি কি কোনো দুআ নাকি আল্লাহর কোনো গুণবাচক নাম? দুটি হওয়ারই সম্ভাবনা আছে। দুটির পক্ষেই কুরআন-হাদিসে দলিল রয়েছে।

'আমিন' যদি দুআ হয়

মুসা আ. আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, হারুন আ. দুআর সঙ্গে 'আমিন' বললেন। আল্লাহ বললেন—

﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا﴾

আমি মুসা এবং হারুন দুজনের দুআই কবুল করে নিলাম। [সুরা ইউনুস : ৮৯]

এখানে 'আমিন'কে দুআ বলা হচ্ছে। হাদিসেও 'আমিন' দুআ হওয়ার পক্ষে দলিল পাওয়া যায়। *সহিহ বুখারি*তে আতা রা. থেকে বর্ণিত, ইমাম বুখারির ভাষায়—

قال البخاری: وقال عطاء: أمين دعاء.

'আমিন' দুআর অন্তর্ভুক্ত।

'আমিন' যদি আল্লাহর নাম হয়

'আমিন' যদি আল্লাহর নাম ধরে নেওয়া যায়, যেতেই পারে। কারণ, সেটার পক্ষেও দলিল বিদ্যমান। আবু হুরায়রা রা. বলেন,

أمين اسم من أسماء الله عز وجل.

'আমিন' হচ্ছে আল্লাহর নামসমূহের মধ্য হতে একটি নাম।[৬৬]

---

[৬৬] *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক* : ২৬৫১।

'আমিন' আল্লাহর নাম হোক বা দুআই হোক, দেখবার বিষয়, সেগুলো উচ্চারণের সঠিক পদ্ধতি কী?

'আমিন'কে যদি দুআ ধরা হয়, তাহলে কুরআনে কারিমে দুআর উসুল বলা হয়েছে—

﴿اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً﴾

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে দুআ করো বিনয়ের সঙ্গে এবং গোপনে। [সুরা আরাফ : ৫৫]

আর 'আমিন'কে আল্লাহর নাম ধরা হলে সেটাও আস্তে বলার নিয়ম। কুরআন বলছে—

﴿وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً﴾

তোমার প্রতিপালককে ডাকো নম্র হয়ে, অনুচ্চস্বরে। [সুরা আরাফ : ২০৫]

সুতরাং 'আমিন' দুআ হোক আর আল্লাহর নামই হোক, মনে মনে বলাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত এবং প্রমাণিত।

দ্বিতীয় কথা

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إذا أمن الإمام فأمنوا، فأنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

ইমাম যখন 'আমিন' বলবেন, তোমরা 'আমিন' বলবে। কারণ' যার 'আমিন' ফেরেশতাদের আমিনের সঙ্গে মিলে যায়, তার পূর্বেকার সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।[৬৭]

এখন ফেরেশতার আমিনের সঙ্গে আমাদের 'আমিন' মেলানোর জন্য দুই আমিনের কোয়ালিটিকে সমান হওয়া দরকার। ফেরেশতারা তো 'আমিন' আস্তে বলেন। এখন আমরা যদি চিল্লায়া বলি তাহলে কেমনে হবে?

মোদ্দাকথা, 'আমিন' আস্তে বলাই উত্তম। অবশ্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম যুগে 'আমিন' জোরে বলেছেন মর্মে কিছু হাদিস পাওয়া যায়। এখন পুরানো হাদিসের ওপর ভিত্তি করে কেউ যদি জোরে বলতে চায় বলুক। আমরা নিম্ন আওয়াজেই বলব, যেহেতু এটাই হুজুরের নিয়মিত আমল ছিল।

---

[৬৭] *সহিহ বুখারি :* ৭৮০।

তারকে কিরাআত খালফাল ইমাম

ইমামের পেছনে নামাজ পড়া মুকতাদিগণকে সুরা ফাতিহা পড়তে হবে কি না; এ নিয়ে এখন মহা কেলেঙ্কারি চলছে। আহাফি আলিমগণ গণহারে ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছেন—ইমামের পেছনেও সবাইকে সুরা ফাতিহা পড়তে হবে। নাহলে নামাজ হবে না। রাসুল বলেছেন, 'সুরা ফাতিহা ছাড়া কোনো নামাজই শুদ্ধ হয় না।'

অথচ প্রশ্ন এখানে সুরা ফাতিহা পড়া না-পড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। প্রশ্ন হলো ইমামের পেছনে থাকা মুকতাদিগণকে সুরা ফাতিহা পড়তে হবে কি না সেটা। চলুন সহজ করে বুঝি।

কিছু ব্যাপার মানুষের সামনে পরিষ্কার করে দেওয়া হয় না বলে বিভ্রান্তিটা বাড়ে; আর এখানেও আমি আহাফিদের কৃতিত্ব দেবো। তারা তাদের পরিভাষা মানুষের মুখে মুখে তুলে দিতে পেরেছে। তারা শুরু করে, 'ফাতিহা খালফাল ইমাম' বা ইমামের পেছনে সুরা ফাতিহা পড়া দিয়ে; কিন্তু যখন দেখে আশেপাশে কোনো আলিম-উলামা নেই, তখন মওকা পেয়ে শিরোনাম পালটে দেয়। তখন সোজাসাপ্টা বলে, নামাজে সুরা ফাতিহা পড়তে হবে কি না?

তাদের এমন প্রচারণায় সাধারণ মুসলমানের কাছেও তাদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যায়। তারা যখন বলে—দেখুন, হানাফিরা বলে সুরা ফাতিহা ছাড়াই নাকি নামাজ হয়ে যায়; অথচ নবি বলেছেন হয় না। এখন আপনারাই চিন্তা করে দেখুন হানাফিদের ইমাম আবু হানিফার কথা মানবেন, নাকি রাসুলের কথা? মানুষ তখন থুতনির নিচে বুড়ো আঙুল দিয়ে কপালে ভাঁজ ফেলে চিন্তা করে আর মনে মনে বলে, কথা তো ঠিক!

অথচ, হানাফি আলিমগণের ব্যর্থতা হচ্ছে তারাও আহাফিদের পরিভাষা আমলে নিয়ে সেভাবেই জবাব দিচ্ছেন। ফলে কাজটা দিনদিন কঠিন করে তোলা হচ্ছে।

সুরা ফাতিহা কি কুরআনের অন্তর্ভুক্ত

যারা বলেন ইমামের পেছনে হলেও সুরা ফাতিহা পড়তেই হবে; না পড়লে নামাজই শুদ্ধ হবে না, তাদের জিজ্ঞেস করা দরকার—

কিরাআত কাকে বলে?

তারা বলবে, তিলাওয়াতে কুরআনকে কিরাআত বলা হয়।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা—সুরা ফাতিহা কি কুরআনের ভেতরে নাকি বাইরে?

জবাবে অবশ্যই তাদের বলতে হবে, কুরআনের ভেতরে।

আচ্ছা, নামাজে সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব; কিন্তু কিরাআত পড়া ফরজ। আর সুরা ফাতিহাও যে কুরআনের ভেতরের অংশ এবং কিরাআতের অন্তর্ভুক্ত, এটাও স্বীকার

করছ। এখন বলো, ইমামের পেছনে থাকা মুকতাদিকে কিরাআতও পড়তে হবে কি না?

তাদের বলতেই হবে, পড়তে হবে না। এ ছাড়া উপায় নেই। যদি বলে পড়তে হবে, তাহলে ইমাম সুরা ফাতিহার পরে যে কিরাআত পড়বেন, সেটা তো সকল মুকতাদির মুখস্থ থাকবে না। তখন কী হবে? বাদবাকি জুহর-আসরে ইমাম কোন কিরাআত পড়ছেন, মুকতাদি তো সেটা বুঝতেই পারবে না। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে ইমামের কিরাআত মুকতাদির কিরাআত হিশেবে গণ্য হয়।

এই যদি হয় অবস্থা, এমন যদি হয় বাস্তবতা, ইমামের পেছনে যদি কিরাআত পড়তে না হয়, আর সুরা ফাতিহাও যদি 'কিরাআতের অন্তর্ভুক্ত' স্বীকার করা হয়, তাহলে ইমামের ফাতিহা পড়া মুকতাদির জন্যও যে যথেষ্ট, এটা বুঝতে এত কষ্ট হয় কেন?

নবির হাদিস; ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয় না

তারা দলিল পেশ করে *বুখারি শরিফ* থেকে। বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

সুরা ফাতিহা পড়া না হলে কোনো নামাজই শুদ্ধ হবে না।[৬৮]

তারা বলে, এত পরিষ্কার হাদিস থাকার পরও হানাফিরা কী করে বলতে পারে, ফাতিহা ছাড়া মুকতাদির নামাজ হয়ে যাবে? হাদিসে তো ইমাম-মুকতাদি আলাদা করে বলা হয়নি!

আসলে যার দৌড় যেটুকু, তার কথাবার্তাও ততটুকু। হাদিস আমরাও পড়ি, হাদিস তারাও পড়েন (বলে দাবি করেন)। হাদিসের এক তরজমা আমরা করি, এক তরজমা তারা করেন। দেখা যায় তাদের তরজমা আমাদের সঙ্গে মিলে না। আমাদেরটা তাদের সঙ্গে মিলে না। এখন উপায় কী?

যুক্তিসংগত সহজ উপায় হলো, সাহাবিগণকে জিজ্ঞেস করে ফেলা। রাসুল হাদিস বলতেন সাহাবিগণকে লক্ষ করে। তাঁরা কোনো কথার মর্ম না বুঝলে রাসুলকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। এ জন্য কোনো হাদিসের ব্যাখ্যা যদি কোনো সাহাবি করে দিয়ে যান, তাহলে তারপরে আর কারও কোনো ব্যাখ্যাই চলে না। চলুন দেখি এই হাদিসের কোনো ব্যাখ্যা সাহাবিগণ থেকে পাওয়া যায় কি না?

عن جابر بن عبد الله أنه يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرأن

[৬৮] *সহিহ বুখারি* : ৭৫৬।

فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام.

ইমাম তিরমিজি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বলেন, যে প্রতি রাকআতে সুরা ফাতিহা পড়ল না, তার নামাজই হবে না; তবে ইমামের পেছনে হলে ভিন্ন কথা। তখন পড়া লাগবে না।[৬৯]

ইমাম তিরমিজি জাবির রা.-এর বরাতে বলেন, ফাতিহা ছাড়া নামাজ হবে না তখন, যখন কেউ একা নামাজ পড়বে। তাহলে তো সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেল। একা নামাজ পড়লে সুরা ফাতিহা পড়তেই হবে, এ কথায় তো কারোই দ্বিমত নেই।

আর ইমামের পেছনে থাকলে ইমামের কিরাআত যে মুকতাদির জন্য যথেষ্ট হয়, এই দাবিও আমরা শুধু যুক্তি খাটিয়ে করছি না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, মুকতাদির ক্ষেত্রে ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট হবে।

أخرج ابن ماجه عن جابر و أخرج الطبرانى فى الأوسط عن أبى سعيد وأخرج ابن حبان عن أنس بن مالك وأخرج الدارقطنى عن ابن عمر وعن أبى هريرة وعن ابن عباس واللفظ له عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك قراءة الإمام خافت أو ظهر، ولفظ ابن ماجه: من كان له إمام فإن قراءة الإمام قراءة له.

আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবু হুরায়রা ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা নকল করে জানান, নামাজ উচ্চ কিরাআতের হোক অথবা অনুচ্চ, (অর্থাৎ, ফজর, জুহর, আসর মাগরিব, এশা, সব নামাজেই) মুকতাদির জন্য ইমামের কিরাআত যথেষ্ট হবে। *ইবনে মাজাহে* আরও যোগ করা হয়েছে, মুকতাদির ক্ষেত্রে ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট হবে।[৭০]

এরপরেও যদি কারও কনফিউশন থাকে, কেউ যদি কনফিউজড থাকেন, তাহলে সেটাকে ওয়াসওয়াসা ছাড়া আর কিছু বলার থাকে না।

কুরআন কী বলে?

আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

---

[৬৯] *তিরমিজি* : ৭১।

[৭০] *উমদাতুল কারি* : ৪/৪৪৮।

> তোমার সামনে যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হবে, তখন মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো। [সুরা আরাফ : ২০৪]

প্রথমেই জেনে রাখি এই আয়াত নামাজের ক্ষেত্রেই নাজিল হয়েছে। দলিল হলো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, 'এই আয়াত নামাজের বেলাতেই নাজিল হয়েছিল।'[৭১]

শোনার জন্য চুপ থাকা শর্ত। কাউকে যদি অন্য কারও কথা শুনতে হয় তাকে অবশ্যই চুপ করে শুনতে হবে। সে যদি নিজেই কথাবলা আরম্ভ করে দেয়, তাহলে কিছুই শুনতে পাবে না। 'কুরআন তিলাওয়াত হলে মনোযোগ দিয়ে শোনো', এতটুকু বললেই যথেষ্ট ছিল। আবার 'চুপ থাকো' বলার দরকার ছিল না। তবুও আল্লাহ চুপ থাকার বাড়তি শব্দটি কেন যুক্ত করলেন? আপাতদৃষ্টিতে শব্দটিকে অর্থহীনই লাগছে; অথচ কুরআনের একটি শব্দও অর্থহীন নয়। তাহলে?

কথা তো এখানেই। আল্লাহপাক দিনরাতে পাঁচবেলা নামাজ ফরজ করে দিয়েছেন। বিধান দিয়েছেন মাগরিব, এশা, ফজরে জোরে কিরাআত পড়ার, জুহর-আসরে আস্তে পড়ার। ইমাম যখন মাগরিব, এশা, ফজরে কুরআন তিলাওয়াত করবেন, মুকতাদি কী করবে?

আল্লাহ বলেন, মনোযোগ দিয়ে শোনো।

—কিন্তু আল্লাহ, জুহর-আসরে তো ইমাম মনে মনে পড়েন। তখন তো কিছুই শোনা যায় না। এই অবস্থায় আমরা কী করব?

আল্লাহ বলেন, চুপ করে থাকো।

পবিত্র কুরআনে এত স্পষ্ট করে বলে দেবার পরও যারা মানুষকে উলটা-পালটা বোঝায়, তাদেরকে কোন খোয়াড়ে বন্দি করে রাখা যায়, সেটাই ভাবনার বিষয়।

ফাতিহা-খাদক

বিশেষ দুই ধরণের লোক আছে সমাজে। একশ্রেণি হলো এমন, আপনাকে এসে বলবে—তুমি যে ইমাম সাহেবের পেছনে নামাজ পড়লে, তুমি কি সুরা ফাতিহা পড়েছ? আপনি বললেন, না। সে বলবে, তাহলে তোমার নামাজ আল্লাহ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাবে না।

আরেক শ্রেণি আছে জিজ্ঞেস করবে, তুমি যে তোমার বাবার জন্য ইসালে সওয়াবে হিশেবে শিরনি করলে, শিরনিতে কি ফাতিহা পড়া হয়েছে? আপনি বললেন, না। সে বলবে, তাহলে তোমার শিরনি আল্লাহ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাবে না।

লক্ষ করছেন, একদল লড়াই করছে 'ফাতিহা খালফাল ইমাম'র জন্য; আর আরেকদল লড়ছে 'ফাতিহা খালফাত-তোয়াম'র জন্য। 'ফাতিহা খালফাল ইমাম' মানে ইমামের

[৭১] *তাফসিরে তাবারি* : ৬/১৬১, *এলাউস সুনান* : ৪/৪৪।

পেছনে ফাতিহা পড়া। 'ফাতিহা খালফাত তোয়াম' মানে খাবারে অর্থাৎ, শিরনিতে ফাতিহা পড়া, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ফাতিহা খানি'। আজিব কথা হলো, ফাতিহা খালফাল ইমামওয়ালা তাকলিদ মানে না; আর ফাতিহা খালফাত-তোয়ামওয়ালা তাওহিদ মানে না। তার মানে তারা ফাতিহার জন্য লড়াই করে; কিন্তু অর্ধেক ফাতিহাই মানে না! আমরা হানাফিরা ফাতিহা খালফাল ইমামের জন্যও লড়ি না, ফাতিহা আলাশ-শিরনির জন্যও লড়ি না। আমরা ফাতিহার জন্য মাইর করি না; কিন্তু পুরা ফাতিহা মানি। তাওহিদও মানি, তাকলিদও।

সালাতুন নবি, ইমামুল আম্বিয়া

মিরাজ-রজনীতে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বায়তুল মাকদিসে যাত্রাবিরতি করছিলেন, তখন সেখানে দু-রাকআত নামাজের ইমামতি করেন তিনি। পেছনে ছিলেন লক্ষাধিক নবি আলাইহিমুস সালাম। আদম থেকে ইসা পর্যন্ত সব নবির আরওয়াহে পাককে আল্লাহ জড়ো করেছিলেন সেখানে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমাম, বাকি সকল নবি মুকতাদি। গায়রে মুকাল্লিদিন ভাইজানরা কী বলেন? শুধু রাসুলের নামাজ শুদ্ধ হয়েছে? অন্য কারও নামাজ শুদ্ধ হয়নি! বলাতো দরকার। অন্য কোনো নবি তো ইমামের পেছনে সুরা ফাতিহা পড়েননি! পড়বেনই-বা কীভাবে! তাদের কারও তো ফাতিহা মুখস্থই ছিল না। তাঁদের কারও ওপর কি সুরা ফাতিহা নাজিলই হয়েছিল নাকি।

এখন কিয়ামতের দিন যদি আল্লাহ ঘোষণা দিয়ে বসেন, কারা কারা ইমামের পেছনে সুরা ফাতিহা পড়োনি, লাইনে দাঁড়াও! তাহলে শুধু আমরাই দাঁড়াব না, আমাদের সঙ্গে দাঁড়াবেন সোয়া লাখ নবি। আমরা থাকব পেছনে, তাঁরা আগে। সুতরাং যেখানে তাদের ঠিকানা হবে, সেখানে যেতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই!

বিতরের নামাজ

বিতর নামাজ নিয়ে আমরা শান্তিতেই ছিলাম। মুসলমানদের মধ্যে এ নিয়ে কোনো অশান্তি ছিল না। মায়ের কথার পর সন্তানের কোনো অশান্তি অবশ্য থাকেও না। সাম্প্রতিক সময়ে লা-মাজহাবিরা বিতর নামাজকে নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। দুই রাকআত/এক রাকআত। মুসলমান এর আগে কখনো এক রাকআতি নামাজ পড়েনি। তারা এখন সেটারও তালিম দিচ্ছে!

أخرج أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى

العشاء دخل المنزل، ثم صلى ركعتين، ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منهما، ثم أوتر بثلاث، لا يفصل بينهن.

আম্মি আয়েশা বলেন, এশার নামাজের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে এসে দু-রাকআত নামাজ পড়তেন। তারপর আরও দু-রাকআত পড়তেন, যা প্রথম দু-রাকআতের চেয়ে দীর্ঘ হতো। তারপর তিন রাকআত বিতর পড়তেন; কিন্তু পৃথক করতেন না।[৭২]

সুতরাং বিতরের নামাজ তিন রাকআতই পড়তে হবে এবং একসঙ্গেই।

আসলে এক রাকআতি কোনো নামাজ নেই। যদি থাকত, মিরাজের সফরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাস্তায় পাঁচ জায়গায় নামাজ পড়েছেন, এক রাকআত করেই পড়তেন—সফরের হালতে নামাজ হয় সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ত।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বোরাকে আরোহণ করিয়ে জিবরিল আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যাত্রা শুরু করলেন, প্রথমেই মদিনায় পৌঁছে বললেন, 'হুজুর, এখানে দু-রাকআত নামাজ পড়ে নিন, একদিন আপনাকে এখানেই হিজরত করে আসতে হবে।' শুয়াইব আ.-এর মাদইয়ান পৌঁছে বললেন, 'এখানেও দু-রাকআত নামাজ আদায় করে নিন।' সিনাই পর্বতের কাছে যেয়ে বললেন, 'এখানেও দু-রাকআত পড়ে নিন।' বায়তুল্লাহ শরিফের কাছে এসে সেখানেও দু-রাকআত পড়তে বললেন। উর্ধ্বাকাশমুখী যাত্রার আগে পৃথিবীর সর্বশেষ স্টপেজ বায়তুল মাকদিসে গিয়ে সোয়া লাখ নবি-রাসুলকে মুকতাদি বানিয়ে দু-রাকআত নামাজের ইমামতি করলেন।

এক রাকআতি নামাজের সুযোগ থাকলে এই সফরে হুজুর এক রাকআত করেই পড়তেন—কমন সেন্স তাই বলে।

তারাবিহ

মূল আলোচনায় বিক্ষিপ্তভাবে তারাবির নামাজের কথা বলা হয়েছে। যেহেতু রমজানুল মুবারক এলেই বিষয়টিকে নিয়ে পরিষ্কার বিভাজন তৈরি করে ফেলতে দেখা যায়, সে জন্যে তারাবিহ নিয়ে একটু বিস্তারিতভাবে কথা হওয়া দরকার; আর কথার শুরুতে কিছু প্রশ্নের মীমাংসা আগে হওয়া দরকার।

প্রথম প্রশ্ন : তারাবিহ আছে কি নেই?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : তারাবিহ কত রাকআত?

---

[৭২] *এলাউস সুনান* : ৬/২৭।

তৃতীয় প্রশ্ন : সাহাবিগণের আমল কী?

এই প্রশ্নগুলোর জবাব সামনে না থাকলে ২০/৮-এর ঝগড়া জিন্দেগিতেও শেষ হবে না।

প্রথম প্রশ্নটি কারও কাছে অনর্থক মনে হলেও এটি কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আহাফি ভাইজানরা তারাবিকে কুপিয়ে ২০ থেকে ৮-এ নামিয়ে আনার জন্য সবচেয়ে বড় গলায় যে হাদিসটি সামনে নিয়ে আসেন, সেটি হলো উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা থেকে বর্ণিত হাদিস।[৭৩]

عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضى الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلى أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أربعا، فلا تسل عن حسنهن و طولهن، ثم يصلى ثلاثا، قالت عائشة: فقلت يارسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة! إن عينى تنامان ولا ينام قلبى.

হাদিসটি সামনে এনে তারা বলেন, ৮ রাকআত তারাবিহ এবং তিন রাকআত বিতির। এরা কীভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে লক্ষ করুন। আম্মি আয়েশাকে রমজানের রাতের নামাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছিল। আয়েশা বুঝতে পেরেছিলেন প্রশ্নকারী তাহাজ্জুদের নামাজ সম্পর্কেই জানতে চাইছেন। তাই তিনি তাহাজ্জুদ ৮ এবং বিতির ৩, মোট ১১ রাকআতের কথা জানিয়েছিলেন। এই হাদিস দিয়ে যারা তারাবিকে ৮ প্রমাণ করতে চায়, তারা মূলত তারাবিকেই অস্বীকার করে; কিন্তু যেহেতু তারাবিহ নেই বললে মানুষ দৌড়ান দেবে, তাই কৌশলে তাহাজ্জুদকে তারাবিহ বলে চালিয়ে দিতে চায়। তারা যে (উপরে উল্লিখিত) হাদিসটি পেশ করে ৮ রাকআতের পক্ষে, সেই হাদিসেই তাদের জালিয়াতির জবাব আছে। আম্মি আয়েশা বলছেন, ولا فى غيره فى رمضان অর্থাৎ, এটি ছিল হুজুরের ১২ মাসের আমল।

আপনাদের সামনে যখন তারা এই হাদিস দিয়ে দলিল দিতে চাইবে, দয়া করে শুধু জিজ্ঞেস করবেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তবে ১২ মাসই তারাবিহ পড়তেন? তাহলে তোমরা শুধু রমজানে পড়ছ কেন?

দ্বিতীয় কথা, প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উদ্দেশ্য যে তারাবিহ ছিল না, উদ্দেশ্য যে তাহাজ্জুদই ছিল, সেটা পরিষ্কার হয়ে যায় আম্মার জবাবে প্রশ্নকারীও সন্তুষ্ট হয়ে বিদায় নেওয়ায়।

---

[৭৩] *সহিহ বুখারি :* ১১৪৭, ২০১৩, ৩৫৬৯।

কারণ, তিনি আর পালটা কোনো প্রশ্ন করেননি। তা নাহলে তো বলতেন, 'আমি ১২ মাসের আমল নয়, রমজানের তারাবিহ সম্বন্ধে জানতে চাইছি।'

তারাবিহ কত রাকআত

এখানে যে ব্যাপারটি মনে রাখতে হবে সেটি হলো, যে হাদিসগুলোতে রমজানের রাতের নামাজের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোয় রাকআতের উল্লেখ নেই। যেগুলোয় রাকআতের কথা আছে সেগুলো টাইমের কথা নেই। যে কারণে ৮ এবং ২০ নিয়ে টানাটানি। আর তারাবিহ-সংক্রান্ত যতগুলো হাদিস আছে, কোনোটায় কিয়ামুল লাইল, কোনোটায় কিয়ামু রমজান বলে তারাবির কথা বোঝানো হলেও একটিমাত্র হাদিসে তারাবিহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর সেই হাদিসে ২০ রাকআতের কথা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। মূল আলোচনায় হাদিসটির কথা জানিয়েছিলাম। *মুসনাদে ইমাম জায়েদে* সায়্যিদুনা আলি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস—

عنه (أى زيد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب) عن أبيه عن جده عن على رضى الله عنه أنه أمر الذى يصلى بالناس صلا القيام فى شهر رمضان أن يصلى بهم عشرين ركعة ، ويراوح ما بين كل اربع ركعات

الكتاب :مسند زيد، كتاب الصلاة، باب القيام فى شهر رمضان.

আলি রা. লোকজনকে রমজানে রাতের নামাজ বা তারাবিহ সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে গিয়ে বললেন, 'এই নামাজ ২০ রাকআত পড়বে। প্রতি দু-রাকআত পরপর সালাম ফিরাবে এবং প্রতি চার রাকআত শেষ করে নতুন চার রাকআত শুরু করার আগে বিশ্রাম নেবে...'

সকল হাদিসের কিতাব সামনে নিলে এই একটিমাত্র হাদিসই পাওয়া যায়, যেখানে তারাবিহ শব্দটি (يُرَاوِحُ) আছে; আর এই হাদিসে রাকআত সংখ্যাও যে ২০ (رَكْعَةً عِشْرِينَ), সেটাও বলা আছে।

আচ্ছা বিতর্কের বাইরে বেরোনোর জন্য ধরে নিলাম ৮ রাকআতের হাদিসও আছে, ২০ রাকআতের হাদিসও আছে। এখন উপায় কী?

উপায় হলো, দেখতে হবে কোনটা নাসিখ এবং কোনটা মানসুখ। অর্থাৎ, কোন হাদিস আমলযোগ্য আর কোনটি রহিত; আর এটা জানার দুই উপায় :

এক. যদি নবিজি নিজে সমাধান দিয়ে যান, তাহলে তো আর ঝামেলায় নেই।

দুই. অথবা দেখতে হবে সাহাবিগণ কোনটাকে আমলে নিয়েছিলেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তামাম সাহাবির উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তারাবিহ ২০ রাকআত। আলি রা. জানিয়েছেন, তারাবিহ ২০ রাকআত। এরপরে যারা ৮-এর গান গাইবে, তাদের পক্ষ থেকে পরিষ্কার ঘোষণা আসা দরকার 'আমরা উমর-আলির কথা বিশ্বাস করি না।'

আসলে আহাফিরা যতই নবির হাদিস নবির হাদিস বলুক, আমলের ক্ষেত্রে দেখা যায় রাসুলের হাদিসের যে অংশ তাদের কাছে পছন্দের মনে হয়, সেটুকু রাসুল থেকে নেয়। বাকি যেটুকু যেখান থেকে নিলে সুবিধা, সেখান থেকেই নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে তারা তাদের পঞ্চম মাজহাব দাঁড় করিয়ে দেয়। তারাবির ব্যাপারটিই দেখুন। তারাবিতে তারা পাঁচটি কাজ করে।

১. তারা ৮ রাকআত তারাবিহ পড়েন।
২. পুরো রমজান তারাবিহ পড়েন।
৩. তারাবিতে কুরআনে কারিম খতম করেন।
৪. জামাআতের সঙ্গে আদায় করেন।
৫. মসজিদে আদায় করেন।

তাদেরকে আমরা বলি, তোমরা তোমাদের এই পাঁচটি কাজের পক্ষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি হাদিস উপস্থাপন করো। তোমরা তো সহিহ হাদিস সহিই হাদিস জিকির করো, আমরা তোমাদের সহজ সুযোগ দিই। শতশত হাদিসের কিতাব থেকে একটি জয়িফ হাদিসই দেখাও। যদি দেখাতে পারো, খোদার কসম আমি তোমাদের আহলে হাদিস হয়ে যাব। সারাজীবন ৮ রাকআত তারাবির পক্ষে জান কুরবান করে দেবো।

আট রাকআতকে তারাবিহ বলা যাবে না

বাংলা উচ্চারণে আমরা 'তারাবিহ' বলি। শব্দটি আসলে 'তারাউয়িহ'। 'তারাউয়িহ' 'তারউয়িহাতুন' শব্দের বহুবচন। 'তারউয়িহাতুন' অর্থ 'বিশ্রাম'। 'তারাউয়িহ' মানে 'বিশ্রামসমূহ'।

বাংলা বচন দুই প্রকার : একবচন, বহুবচন। ইংরেজিতেও দুই প্রকার : সিঙ্গুলার, প্লুরাল। কিন্তু আরবিতে বচন মোট তিন প্রকার : ওয়াহিদ, তাসনিয়া, জমা, একবচন, দুইবচন এবং বহুবচন। বাচনিক ব্যাখ্যার কারণ হলো এই—

তারাবিহকে তারাবিহ বলা হয় কারণ, এই নামাজ বিশ্রাম করে করে পড়া লাগে।

প্রতি চার রাকআত পরপর বিশ্রাম নিয়ে দুআ পড়া হয়। একটি বিশ্রাম হলে সেটাকে আরবিতে বলা যাবে তারউয়িহাতুন, দুই বিশ্রামকে তারউয়িহাতান এবং কমপক্ষে তিনটি বিশ্রাম নেওয়া হলে তবেই তাকে তারাবিহ বলা যাবে। এখন কেউ যদি বলে তারাবিহ চার রাকআত, তাহলে সে তারাবিহ অর্থই বোঝেনি। কারণ, সেটার নাম তখন হবে তারউহাতুন। কেউ যদি বলে তারাবিহ ৮ রাকআত, তাহলে সেটাকে তারাবিহ না বলে বলতে হবে তারউয়িহাতান। কেউ যদি বলে ১২ রাকআত, তাহলেও সেটাও তারাবিহ হবে না। ব্যাকরণিকভাবে তিন বিশ্রাম অর্থে বারো রাকআতে তারাবিহ শব্দের প্রয়োগ শুদ্ধ হলেও সেটাকেও মূলত তারাবিহ বলা যাবে না, কারণ—

তারাবিকে তারাবিহ বলতে হলে কমপক্ষে চারটি বিশ্রাম নেওয়া লাগবে। আলি রাজিআল্লাহু তাআলা বর্ণিত হাদিসে লক্ষ করে থাকবেন বাক্যটি হচ্ছে—

تَرْوِيحَةٌ رَكْعَاتٍ أَرْبَعٍ كُلَّ بَيْنَ مَا وَتَرَاوِيحُ মানে, দুটি চার রাকআতের মধ্যখানের বিশ্রামকে তারউয়িহা বলা হয়। এই অর্থে কম করে হলেও ১৬ রাকআত না হলে সেখানটায় তারাবিহ শব্দের প্রযোগই সঠিক হয় না।

অতএব, তারাবিহ ৮ রাকআত বলার কোনো চান্সই নেই।

রাফে-ইয়াদাইন

এ আরেক মসিবত। রুকুতে যাওয়ার আগে আর রুকু থেকে উঠার আগে তাকবিরে তাহরিমার মতো হাত না উঠালে নামাজই হবে না! আরে বাবা, তোমার ভালো লাগলে তুমি হাত উঠাও—বারণ করছিল কে? আমরা বার বার হাত উঠাই না। কারণ, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ নামাজগুলো ছিল রাফে-ইয়াদাইন ছাড়া।

أخرج النسائى و أبوداود والترمذى وحسنه عن ابن مسعود قال: ألا أصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا فى أول مرة . هذا حديث صححه ابن حزم فى المحلى.

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি কি তোমাদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাজ দেখাব? তারপর তিনি নামাজ পড়লেন, তাতে (তাকবিরে তাহরিমার সময়) একবার ছাড়া আর দ্বিতীয়বার হাত উঠালেন না।[৭৪]

---

[৭৪] *সুনানে আবু দাউদ* : ৭৪৮; *সুনানে তিরমিজি* : ২৫৭; *সুনানে দারেমি* : ১৩০৪; *সুনানে নাসায়ি* : ৬৪৫; *সুনানে বায়হাকি কুবরা* : ২৩৬৩; *মুসনাদে আহমাদ* : ৩৬৮১।

أخرج ابن أبى شيبة عن البراء بن عازب أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذافتتح الصلاة رفع يديه، ثم لا يرفعهما حتى يفرغ.

বারা ইবনে আজিব রা. থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাজ শুরু করতেন, তখন হাত উঠাতেন, তারপর নামাজ শেষ করা পর্যন্ত আর হাত উঠাতেন না।[৭৫]

عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لى أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا فى الصلاة.

জাবির ইবনে সামুরাহ রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, নামাজের মুহূর্তে হুজুর আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, 'তোমাদের কী হলো যে, তোমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি তোমরা রাফে-ইয়াদাইন করছ বেয়াড়া ঘোড়ার লেজের ন্যায়? নামাজের মধ্যে শান্ত-ধীর হও।'[৭৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্থিরতার সঙ্গে নামাজ পড়ার আদেশ দিয়েছেন। আর হাদিসের বক্তব্য অনুযায়ীই যেহেতু রাফে-ইয়াদাইন স্থিরতা পরিপন্থি, তাই আমাদের কর্তব্য হলো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশমতো স্থিরতার সঙ্গে নামাজ পড়া।

হজরত উমরের আমল

আসওয়াদ রাহ. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন,

صليت مع عمر فلم يرفع يديه فى شىء من صلاته إلا حين يفتتح الصلاة.

আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে দেখেছি, তিনি নামাজের শুরুতে রাফে-ইয়াদাইন করতেন, পরে আর করতেন না।[৭৭]

হজরত আলির আমল

عن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود.

---

[৭৫] *ইবনে আবি শায়বা* : ২৪৫৫।

[৭৬] *মুসলিম* : ৯৯৬; *সুনানে আবু দাউদ* : ১০০২; *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ১৮৭৮; *মুসনাদে আবি আওয়ানা* : ১৫৫২; *মুসনাদে আবি ইয়ালা* : ৭৪৮০; *মুসনাদে আহমাদ* : .২০৯৯৮; *মুসনাদুর রাবি* : ৯১২, *মুসনাদে তায়ালিসি* : ৭৮৬; *তাহাবি শরিফ* : ২৪২৮।

[৭৭] *ইবনে আবি শায়বা* : ২৪৬৯।

আলি রা. নামাজে প্রথম তাকবিরে হাত উঠাতেন এরপর আর হাত উঠাতেন না।[৭৮]

আবদুল্লাহ ইবনে উমরের আমল

عن مجاهد قال: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا فى أول ما يفتتح.

মুজাহিদ রাহ. বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের পেছনে নামাজ পড়েছি। তিনি প্রথম তাকবির ছাড়া অন্য সময় রাফে-ইয়াদাইন করতেন না।[৭৯]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের আমল

إنه كان يرفع يديه فى أول ما يفتتح الصلاة ثم لا يرفعهما.

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. শুধু প্রথম তাকবিরের সময় রাফে-ইয়াদাইন করতেন, এরপর আর করতেন না।[৮০]

কত আর উদাহরণ টানব? হাদিসের কিতাবাদির পরতে পরতে দলিল বিদ্যমান; অথচ এরা মানুষকে বোঝায় নামাজে রাফে-ইয়াদাইন না করলে নামাজই শুদ্ধ হয় না।

আরে বাবা, তোমরা নিজেরাই তো রাফে-ইয়াদাইনের কিছু মানছ কিছু মানছ না! নবি তো সিজদা থেকে উঠার সময়ও রাফে-ইয়াদাইন করেছেন মর্মে হাদিস আছে।[৮১]

وفى مشكل الأثار عن أبن عمر أنه كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.

হাদিসের আলোকে তো পরিষ্কার প্রমাণিত হয় নবিজি নামাজের মোট ৩২ স্থানে রাফে-ইয়াদাইন করেছেন। নবি ঝুঁকতে এবং উঠতে রাফে-ইয়াদাইন করতেন। চার রাকআত নামাজে ৩২ জায়গা আছে এমন :

প্রথম রাকআতের শুরুতে ১ বার।

দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকআতের শুরুতে ৩ বার।

চার রাকআতের ৪ রুকুতে যেতে-উঠতে ৮ বার।

---

[৭৮] প্রাগুক্ত : ২৪৫৭।
[৭৯] প্রাগুক্ত : ২৪৬৭।
[৮০] প্রাগুক্ত : ২৪৫৮।
[৮১] *ফাতহুল বারি* : ২/২৮৪।

চার রাকআতের ৮ সিজদাতে যেতে-উঠতে ১৬ বার।

দুই সিজদার মধ্যেখান আলাদা ধরলে আরও ৪ বার

সব মেলালে, ১+৩+৮+১৬+৪=৩২ হয়।

সব মানলে তো ৩২ বার রাফে-ইয়াদাইন করা উচিত। তারা আবার সবগুলো করে না। কয়েক কোয়ালিটির রাফে-ইয়াদাইন দৃশ্যমান হয়। কেউ করে প্রথম এবং তৃতীয় রাকআতের শুরুতে, আর রুকুতে যাওয়া ও উঠার সময়। কেউ চার রাকআতের শুরুতে চার মরতবা এবং রুকুর বেলায়।

তোমরা যদি এতই হাদিস হাদিস করো, তবে সবগুলো করো না কেন?

প্রশ্ন করলে বলে, রাসুল প্রথম প্রথম এগুলো করতেন। পরে বাকিগুলো ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা বলি, যে দলিল দিয়ে তোমরা বাকিগুলো ছেড়ে দিয়েছ, সেই একই দলিল দিয়ে তো আমরাও ছেড়েছি। কিছু বুঝলে আর কিছু না-বুঝলে কীভাবে হবে?

অতি সহনশীল কিছু মুসলমানকে বলতে শোনা যায়, যেহেতু নবিজি প্রথম যুগের নামাজে রাফে-ইয়াদাইন করতেন মর্মেও কিছু হাদিস পাওয়া যায়, তাহলে আমরা কেন সেটায় আমল করছি না?

উচিত জবাব হতো এই, প্রশ্নটি আমাদের না করে নবিজিকেই করো, তিনি কেন কিছুদিন রাফে-ইয়াদাইন করে পরবর্তীতে ছেড়ে দিলেন! যেহেতু এই মুহূর্তে এমন কথা অর্থহীন হবে, তাই এদেরকে আমরা পরামর্শ দেবো মাঝে মাঝে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো হিজরতের পর ১৭ মাস বায়তুল মাকদিসকে কিবলা বানিয়েই নামাজ আদায় করেছেন।

তারা বলবেন, এটা তো আগে কিবলা ছিল। এখন নেই।

আমরা বলব, রাফে-ইয়াদাইন আগে ছিল এখন নেই। যে কারণে মাঝেমধ্যে বায়তুল মাকদিসের দিকে এখন নামাজ আদায় করার কোনো যুক্তি নেই, সেই একই কারণে রাফে-ইয়াদাইন করারও যুক্তি নেই।

কুচ আয়া সমঝমে?

আহাফিদের বেআদবি

আহাফিরা 'মাজহাব মানি না' বললেও মূলত হানাফি মাজহাবই তাদের অন্তরজ্বালার কারণ। তাদের যত ক্ষোভ সব ইমাম আবু হানিফার ওপর। মুসলমান জানে না আবু হানিফা তাদের কোন বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছেন। বিশ্বের ৮০% মুসলমান আবু হানিফার মাজহাব অনুসরণ করে; এটা তো তাঁর দোষ হতে পারে না। নাকি এটাই তাঁর অপরাধ, কে জানে!

তারা আবু হানিফার নাম ধরে ধরে গালিগালাজ করতে থাকে। কিছুদিন আগে নিউ ইয়র্কে জ্যামাইকায় আহাফিরা প্রজেক্টারে একটি শর্টফিল্ম প্রদর্শন করে। সেখানে একটি বড় গরুর সঙ্গে লম্বা রশি বেঁধে একমাথা গরুর গলায় আর অন্য মাথা একপাল ছাগলের গলায় বেঁধে দেওয়া দেখানো হয়। আর নিচে ক্যাপশন লিখে দেওয়া হয়, গরুটি হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা আর ছাগলগুলো তাঁর অনুসারী আলিম!

অসভ্যতার কত নিম্নস্তরে নেমেছে তারা! বেআদবির কত চরম পর্যায়ে চলে গেছে তাদের আচরণ! আমরা সহ্য করছি। আমরা গালির জবাব গালি দিয়ে দিচ্ছি না। আমাদের ইমাম, আমাদের আকাবির আলিমগণ আমাদের এই শিক্ষা দেননি। আজও তাদের এই অসভ্যতার জবাবে গালি দেবো না। আমরা তাদের গাধা বলব না। গাধাদের গাধা হওয়ার কাহিনিটিই শুধু বলব; আর সেটা অবশ্যই কুরআন-হাদিসের আলোকে।

আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

সেই মুমিনগণ সফল, যারা নামাজে খুশুর সাথে দাঁড়ায়। [সুরা মুমিনিন : ১-২]

খুশু মানে কী? কীভাবে দাঁড়ালে খাশিউন-ওয়ালা নামাজ হয়, ব্যাখ্যা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। তিনি বলেন,

مخبتون متواضعون لاَ يلتفتون يميناً شمالاً ولا يرفعون أيديهم في الصلاة.

মুখবিতুনা মুতাওয়া-জিউন, লা-ইয়ালতাফিতূনা ইয়ামিনাউ-ওয়ালা-শিমালা, ওয়ালা ইয়ার-ফাউনা আইদিয়াহুম ফিস-সালাত।

খুশুওয়ালা নামাজ হলো সেই নামাজ, যে নামাজে বিনয় থাকে, ডানে-বামে তাকায় না এবং রাফে-ইয়াদাইন করে না।[৮২]

বোঝা গেল খুশু-খুজুর নামাজ হলো সেই নামাজ, যে নামাজে রাফে-ইয়াদাইন করা হয় না। يمينا ولا شمالا

অন্যদিকে নামাজ কাদের জন্য বোঝা আর কাদের জন্য হালকা, সে ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾

যাদের নামাজে খুশু নেই, তাদের ওপর নামাজ বোঝা। [সুরা বাকারা : ৪৫]

দুই আয়াত একত্র করি। যে নামাজে রাফে-ইয়াদাইন করা হয়, সেই নামাজে খুশু থাকে না। যে নামাজে খুশু থাকে না সেই নামাজ নামাজির জন্য বোঝা। এখন দেখুন লা-মাজহাবিদের ওপর নামাজ কীভাবে বোঝা হয়।

গাধা যতক্ষণ খালি থাকে, স্বাভাবিকভাবেই দাঁড়ায়। যখনই তার ঘাড়ে বোঝা উঠিয়ে দেওয়া হয় তখন তার দুই পা দুইদিকে ছড়িয়ে দেয়। লা-মাজহাবি গায়রে মুকাল্লিদিনরাও তাই। দুনিয়ার যেখানেই যায় যেখানেই দাঁড়ায় এবং সোজা হয়েই দাঁড়ায়; কিন্তু যখনই রাফে ইয়াদাইন-ওয়ালা নামাজে শুরু করে, তখন আর দুই পা একত্রে সোজা রাখতে পারে না, পা ছড়িয়ে দেয়!

গাধার সঙ্গে এতবেশি মিল থাকার পরও আমরা তাদের গাধা বলি না। বলি না কারণ, আমাদের ইমাম আমাদের গালির জবাব গালি দিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন।

আশাকরি লা-মাজহাবিগণ উলটা-পালটা অপপ্রচার চালিয়ে যে বিভ্রান্তিগুলো ছড়ায়, সেগুলোর অসারতা নিয়ে মুসলমানদের আর কোনো সন্দেহ নেই।

পূণশ্চ

নামাজে রাফে-ইয়াদাইন করলেই যদি সেই নামাজ খুশুহীন হয়ে যায়, তাহলে শাফিয়ি মাজহাবে যে করা হয়! তাদের নামাজও কি তাহলে...

উত্তর হচ্ছে, 'না'।

কেন নয়, সেটার ব্যাখ্যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

কথা শেষ করি ডিজিটাল গাধা এবং এনালগ গাইয়ের একটা গল্প বলে।

---

[৮২] *তানজিরুল মিকআস আন তাফসিরে ইবনে আব্বাস।*

গাধা সমাচার

যারা হাদিসের আগাগোড়া কিছুই না জেনে আহলে হাদিস, এই শেষ অংশ তাদের জন্য উৎসর্গিত।

লোহাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি ভেসে থাকো কী করে? তোমার তো সবসময় ডুবে থাকবার কথা। লোহা জবাব দিলো, সঙ্গ-গুণে। কলসিকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি ডুবে গেলে কী করে? তোমার তো ভেসে থাকবার কথা! কলসি জবাব দিলো, সঙ্গ-দোষে। সঙ্গ ব্যাপারটি আসলেই অ্যাফেক্টিভ। শয়তান ফেরেশতাদের সঙ্গ পেতে পেতে (প্রায়) ফেরেশতা হয়ে গিয়েছিল। আবার নুহ আ.-এর ছেলে সাম বিগড়ে গিয়েছিল বখাটেদের পাল্লায় পড়ে।

অনেক অনেকদিন আগের কথা। 'সমগ্র বাংলাদেশ ৫ টন' লেখা ট্রাক আবিস্কার হয়নি তখনো। ব্যবসায়ীরা মালামাল বহনে গাধা ব্যবহার করত। সেই সময়ের গল্প।

এক লোক শহরে গেছে মাল কিনতে। সেদিন আমদানি একটু বেশি ছিল বোধয়। দেখল জিনিসপত্রের দাম সস্তা। সুযোগটা সে ভালোভাবেই কাজে লাগাল। অনেক মাল কিনে ফেলল সে। মালগুলো সব গাধার পিঠে তুলে দিয়ে নিজেও চেপে বসল গাধায়। চলল বাড়ির উদ্দেশে।

গাধা চলুক। অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে তাকে। এই ফাঁকে আমরা বরং একটি গরুর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারি।

এক গৃহস্থের ছিল এক বলদ। ব্যাটা ছিল বুদ্ধিজীবী-টাইপ। তবে ভীষণ ত্যাঁদড় ছিল সে। সবসময় পঙ্গুত্বের অভিনয় করে থাকত। সকালবেলা গোয়ালঘর থেকে বেরোনোর সময় পা টেনে টেনে বের হতো। মাঠে গিয়ে দিব্যি ভালো মানুষ। আবার বিকেলে বাড়ি ফেরার সময় পা টেনে টেনে এসে ঢুকত। মালিক তাকে হালচাষের কোনো কাজেই লাগাত না। ভাবত বেচারা ল্যাংড়া গরু—দিনকাল বেশ ভালোই কাটছিল তার।

গাধা চলছে। মাত্রাতিরিক্ত মালের ভারে কুঁজো হয়ে চলছে বেচারা। চলতে চলতে এসে দেখা হয়ে গেল সেই বুদ্ধিজীবী বলদের সঙ্গে। গাধাকে এই অবস্থায় দেখে বাঁকা একটি

হাসি দিয়ে বলদ বলল, ব্যাটা গাধা কোথাকার। এ জন্যই তো তোর নাম গাধা। কত মাল উঠিয়েছে পিঠে। আবার নিজেও চেপে বসেছে; আর তুই টেনে নিয়ে যাচ্ছিস। গাধার গাধা।

গাধা বলল, ভাইরে, কী আর করব বলো। গাধা হয়ে জন্মেছি। সবই কপাল।

—আরে রাখ তোর কপাল। তুইও দেখছি বেকুব মানুষের মতো কথা বলতে শুরু করেছিস। মানুষ যখন আক্কেল-দোষে কোনো বিপদে পড়ে তখন বলে, কপালে ছিল।

তারপর গরুটি তার লেজ নাড়িয়ে মাছি তাড়ানোর মতো করে একধরণের আয়েশি ভঙ্গিতে বলল, আর এই আমাকে দেখ। আমাকে কি তোর কাছে অসুস্থ মনে হয়?

গাধা বলল, জি না।

—কিন্তু আমার মালিকের কাছে মনে হয়। সে-ও তুই প্রজাতির। সে ভাবে, আমি অসুস্থ। সে-ও মোটামুটি একটা গা...

গাধা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল। বুদ্ধিজীবী গরু বলল, আমি একদম ঠিক আছি। কোনো সমস্যা নেই আমার। খাই-ধাই, ফুর্তি করে ঘুরে বেড়াই। মালিক তো কি, মালিকের বাপেরও ক্ষমতা হয় না আমাকে দিয়ে কোনো কাজ করায়।

—সেটা কী করে সম্ভব! গাধার চোখে অবিশ্বাস।

মুচকি একটা হাসি দিয়ে গরু বলল, এ জন্য সামান্য বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে; আর কিছু না।

—কেমন বুদ্ধি ভাই? বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল গাধা।

মুখে ব্যঙ্গাত্মক হাসিরেখা টেনে বলদ বলল, এইতি সকালবেলা গোয়ালঘর থেকে বেরোনোর সময় পা টেনে টেনে বের হই। আবার বিকেলে বাড়ি ফেরার সময় পা টেনে টেনে গিয়ে ঢুকি। মালিক মনে করে আমি বুঝি ল্যাংড়া। আচ্ছা তুমি আমার ঘাড়ের দিকে চেয়ে দেখ তো! কোনো স্পট আছে?

—না

—থাকার কথাও না। জীবনে কখনো কাধে জোয়াল তুললে তবে না দাগ পড়বে।

বলদের বুদ্ধিদীপ্ত বর্ণনা শুনে গাধা তো রীতিমতো অভিভূত! সে বলল, আরে ভাই! কী মচৎকার বুদ্ধি তোমার!

গরু বলল, 'মচৎকার' মানেটা কী? আমি আমার মালিককে মাঝেমধ্যে 'মচৎকার' বলতে শুনেছি।

গাধা বলল, এটা চমৎকার থেকে একটু বেশি। গাধা-সমাজের পরিভাষা। বাদ দেন। গাধাদের সব কথা ধরতে হয় না। আচ্ছা ভাই, আপনার তো অনেক বুদ্ধি! আমাকে একটা

বুদ্ধি দেন না। আজীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। (বলদের বুদ্ধি দেখে গাধা 'তুমি' থেকে 'আপনি'তে উঠে এসেছে। এমন বুদ্ধিমান একজনকে তুমি করে বলা বেআদবি)

বলদ মাথাটা হালকা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, এত করে যখন বলছ, তখন তোমার জন্য তো কিছু করতেই হয়। আচ্ছা রাখো। আমাকে একটু ভাবতে দাও। দেখি তোমার জন্য কী করতে পারি...।

গরু আর গাধা। কথা বলছিল হাঁটতে হাঁটতে। গাধার পিঠে বসে থাকা সলিমুদ্দি আয়েশ করে বিড়ি ফুঁকছিল আর ভাবছিল, আজ মালগুলো খুব সস্তায় পাওয়া গেছে। অনেক লাভ হবে। কল্পনায় সে লাভের টাকা গুনতেও শুরু করেছে। ঠিক সেই মূহূর্তে ঘটল এক দুর্ঘটনা। গাধাটি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। মাল গেল একদিকে, সলিমুদ্দি অন্যদিকে। কোমরে বেশ ভালো ব্যথাও পেলো সে। কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালো; কিন্তু অনেক খোঁচাখুঁচির পরও গাধাকে আর উঠাতে পারল না। কীভাবে পারবে! সলিমুদ্দি তো আর জানে না এটি এক মহা-বুদ্ধিজীবী গরুর সাজানো পরিকল্পনা।

গাধা যখন বুদ্ধি চাইছিল গরুর কাছে, গরু বলেছিল, 'এক কাজ করো। সামনে ধানক্ষেতের কোনো উঁচু আইলে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেয়ো; আর উঠো না। তোমার মালিক ভাববে, পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছ, তাই উঠতে পারছ না। তখন সে তার মাল অন্যভাবে নেওয়ার ব্যবস্থা করবে...' সবকিছুই ঘটছে পরিকল্পনামাফিক।

সলিমুদ্দি পড়ল মহা সমস্যায়। হাওরের মধ্যখানে এতগুলো মাল নিয়ে এখন সে কী করবে? সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। এদিকে আকাশের অবস্থাও ভালো না। যেকোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। আবার রাত হয়ে গেলে ডাকাত-টাকাতের পাল্লায় পড়তে হয় কি-না কে জানে। একটু আগেই লাভ গুনছিলেন। এখন জান নিয়েই টানাটানি।

ইতিমধ্যে আশপাশের গ্রাম থেকে অনেক লোকজন এসে জড়ো হয়েছে। সবাই চেষ্টা করছে গাধাটিকে উঠাতে; কিন্তু গাধা তো আর উঠে না। মাটি কামড়ে পড়ে আছে সে। মুরব্বি-টাইপ এক লোক সলিমুদ্দিকে বললেন, জনাব, আল্লাহপাকের নামে কিছু মান্নত করেন। একমাত্র আল্লাহই পারেন আপনাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে।

সলিমুদ্দি তখন বলল, আমি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য একটি পশু সদকা করতে চাই। আপনারা আমাকে একটি ছাগলের ব্যবস্থা করে দিন।

বুদ্ধিজীবী বলদের মালিকও ছিল সেখানে। সে দৌড়ে এসে বলল, জনাব, আমার একটা গরু আছে। পায়ে সামান্য সমস্যা, তবে খুবই মোটাতাজা, একদম হৃষ্টপুষ্ট। আপনি এটা নিয়ে যান। মান্নত পুরা করেন। আমাকে যত খুশি দিলেই হবে। এমনিতেই এটা আমার কোনো কাম-কাজে লাগে না। আপনি নাহয় ছাগলের দামই দিয়েন। সমস্যা নেই।

গরু কেনা হয়ে যাবার পর লোকজন ছুরি চাকু জোগাড় করতে লাগল। পাঞ্জেগানা মসজিদের ইমাম সাহেবের অপেক্ষা করা হচ্ছে। তিনি এসে হালকা একটা মুনাজাত দিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করবেন।

গাধা এতক্ষণ ধরে সব দেখছিল। সে ভাবল, আমাকে বুদ্ধিদাতা বলদের যদি এই হালত হয়, তাকে যদি এভাবে মেরে-কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়, না জানি আমার জন্য আরও ... ...ণাম অপেক্ষা করছে। সুতরাং অভিনয় করে আর ... বাড়িয়ে লাভ ... ই। এক লাফে দাঁড়িয়ে গেল সে।

সলিমুদ্দি ... মহাখুশি। যে মুরব্বি সদকা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনি বললেন, আপনার সদকা হাতে হাতে কবুল হয়ে গেছে। বলেন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ।

সলিমুদ্দি 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' বলতে বলতে গাধার পিঠে মাল উঠাতে লাগল। লোকজনও সাহায্য করছে তাকে। মালপত্র উঠানোর পর সে বলল, আচ্ছা ভাইয়েরা, এবার আমাকে বিদায় দিন।

লোকজন বলল, তা কী করে হয়! আপনার শিরনী আর আপনি নিজে উপস্থিত থাকবেন না, সেটা কেমন কথা?

—অনেক দূর যেতে হবে আমাকে। আপনারা গোশত ভাগ করে নিয়ে যান।

—তাহলে কিছু গোশত নিয়ে যান সঙ্গে করে।

—ভাই, গাধার পিঠে জায়গা কোথায়! এমনিতেই লোড অনেক বেশি।

—লোকজন নাছোড়বান্দা। তারা বলল, অন্তত মাথাটা হলেও নিয়ে যান।

—কীভাবে নেব-রে ভাই! উপায় নেই তো!

—দাঁড়ান, একটা ব্যবস্থা করছি।

সবাই মিলে বলদের মাথা রশি দিয়ে ঝুলিয়ে দিলো গাধার গলায়। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথে যাত্রা করল সলিমুদ্দি।

গাধা চলছে। চলছে তো চলছেই। একে তো আগে থেকেই ছিল অভার লোড। এখন আবার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বুদ্ধিজীবীর মাথা। হাঁটতে গিয়ে মাথাটা এসে ঠাস করে লাগে হাটুর সঙ্গে। ব্যথাও লাগে আবার ঢং ঢং শব্দও হয়। গাধাটি তখন দুঃখ করে বলছিল, 'কু সঙ্গে সঙ, গলায় ঢং ঢং!'

গ্রন্থপঞ্জি

০১. আল কুরআনুল কারিম; আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

০২. সহিহ বুখারি শরিফ; ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারি।

০৩. সহিহ মুসলিম শরিফ; ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ নিশাপুরি।

০৪. জামে তিরমিজি; ইমাম আবু ইসা মুহাম্মাদ তিরমিজি।

০৫. সুনানে আবু দাউদ; ইমাম সুলায়মান ইবনে আশআস আবু দাউদ।

০৬. সুনানে ইবনে মাজাহ; আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মাজাহ।

০৭. সুনানে নাসায়ি; ইমাম আহমাদ ইবনে শুয়াইব আন নাসায়ি।

০৮. তাহাবি শরিফ; ইমাম আবু জাফর তাহাবি।

০৯. মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা (তাহকিককৃত নুসখা); শায়খ আওয়ামা দা.বা.।

১০. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক; ইমাম আবু বকর আবদুর রাজ্জাক আস-সানআনি।

১১. মিশকাত শরিফ; খতিব আত-তাবরিজি।

১২. তাবরানি শরিফ; আবুল কাসিম সুলায়মান ইবনে আহমদ আত-তাবরানি।

১৩. মুস্তাদরাকে হাকিম; হাকিম আন-নিশাপুরি।

১৪. আদ দুররুল মানসুর; ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি।

১৫. তাফসিরে কবির; ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি।

১৬. তাফসিরে ইবনে কাসির; হাফিজ আল্লামা ইমাম উদ্দিন ইবনে কাসির।

১৭. তাফসিরে আজিজি; শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি।

১৮. তাফসিরে রুহুল বায়ান; ইসমাইল হাক্কি আল বারসাওয়ি।

১৯. মাজমাউল জাওয়াইদ; ইমাম আলি ইবনে আবু বাকার আল হাইসামি।

২০. সিয়ারু আলামিন নুবালা; ইমাম জাহাবি।

২১. এলামুল মুক্কিয়িন; হাফিজ ইবনুল কায়্যিম।

২২. হায়াতুস সাহাবা; ইউসুফ কান্ধলবি।

২৩. ফাতহুল বারি; ইবনে হাজার আসকালানি।

২৪. উমদাতুল কারি; হাফিজ বদরুদ্দিন আল-আইনি।

২৫. তুহফাতুল আহওয়াজি; আবদুর রহমান মুবারকপুরি।

২৬. গুনিয়াতুত তালিবিন; আবদুল কাদির জিলানি।

২৭. ফাজায়েলে আমাল; শায়খুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া।

২৮. নাসবুর রায়াহ; ইমাম জায়লায়ি।

২৯. এলাউস সুনান; জাফর আহমদ ওসমানি।

৩০. ইকমালুল মুলিম (শরহে মুসলিম); কাজি আয়াজ।

৩১. আল মিনহাজ (শরহে মুসলিম); ইমাম মুহিউদ্দিন নববি।

৩২. দরসে তিরমিজি; তাকি উসমানি।

৩৩. দরসে বুখারি-দরসে মিশকাত; শায়খুল হাদিস আল্লামা ইসহাক।

৩৪. তালখিসুল হাবির; ইবনে হাজার আসকালানি।

৩৫. আবে হায়াত; কাসিম নানুতবি।দদ

৩৬. মুসনাদে ইমাম জায়েদ; ইমাম জায়েদ বিন আলি বিন হুসাইন বিন আলি রা.।

৩৭. তাফসিরে তাবারি; ইমাম ইবনে জারির আত-তাবারি।

৩৮. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া; হাফিজ ইবনে কাসির।

৩৯. আস-সুনানুল কুবরা; ইমাম বায়হাকি।

৪০. সুনানে দারকুতনি; ইমাম হাফিজ আবুল হাসান আলি।

৪১. তাবরানি শরিফ (কবির); ইমাম তাবরানি।

৪২. আতরাফুল হাদিসিন-নাবাউয়িশ-শারিফ; আবু হা-জার মুহাম্মাদ আস সাইদ।

৪৩. বুলুগুল আমানি ফি সিরাতিল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনিল হাসান আশ শায়বানি; মুহাম্মাদ জাহিদ বিন হাসান আল কাওসারি।

লেখকের অন্যান্য বই

- মুমিনের নামাজ
- কাচের দেয়াল
- যে কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো
- বিরাট ওয়াজ মাহফিল
- একটি স্বপ্নভেজা সন্ধ্যা
- হুমুল্লাজিনা
- বিশ্বাসের বহুবচন
- পাগলের মাথা খারাপ
- আহাফি
- জ্ঞান বিজ্ঞান অজ্ঞান
- সুখের মতো কান্না
- সেদিনও বসন্ত ছিল
- মমাতি
- বেত্তমিজ
- আহাফি-২

এই প্রজন্মের শক্তিমান লেখক রশীদ জামীল, যাঁকে তরুণ লেখকদের আইডলও বলা যায়। তরুণদের অনেকেই যাঁর লেখার স্টাইল ফলো করে। রশীদ জামীল লেখালেখি করছেন ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। দেশবিদেশের পত্রিকা-জার্নালে লিখেছেন তিন শতাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও কলাম। ঘুরেছেন ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার অনেক দেশ।

কঠিন কথা সহজ ভাষায় লিখতে পারা কঠিন একটি কাজ। কিন্তু এই কঠিন কাজটি রশীদ জামীল সহজভাবে করে থাকেন। *সুখের মতো কান্না, একটি স্বপ্নভেজা সন্ধ্যা, সেদিনও বসন্ত ছিল, হুমুল্লাজিনা, বিশ্বাসের বহুবচন, যে কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো, জ্ঞান বিজ্ঞান অজ্ঞান, আহাফি, মমাতি, পাগলের মাথা খারাপ*-সহ পাঠকপ্রিয় অনেক বইয়ের রচয়িতা এই লেখক ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ তরুণ কলামিস্ট হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

দীর্ঘ দুই দশক ধরে কাছে থেকে দেখা এই লেখকের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি যা ভাবেন এবং বিশ্বাস করেন তা-ই অকপটে লিখে ফেলেন। এতে কেউ খুশি হয় কেউ করে গালিগালাজ। তখন তিনি তাঁর অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগান। সেটি হলো তিরস্কার এবং তোষামোদ—দুটোকেই পাশ কাটিয়ে চলা।

লেখকের পথচলা আরও বেশি প্রাণবন্ত হোক।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী

Kalantor Prokashoni

ISBN : 978-984-96950-8-0

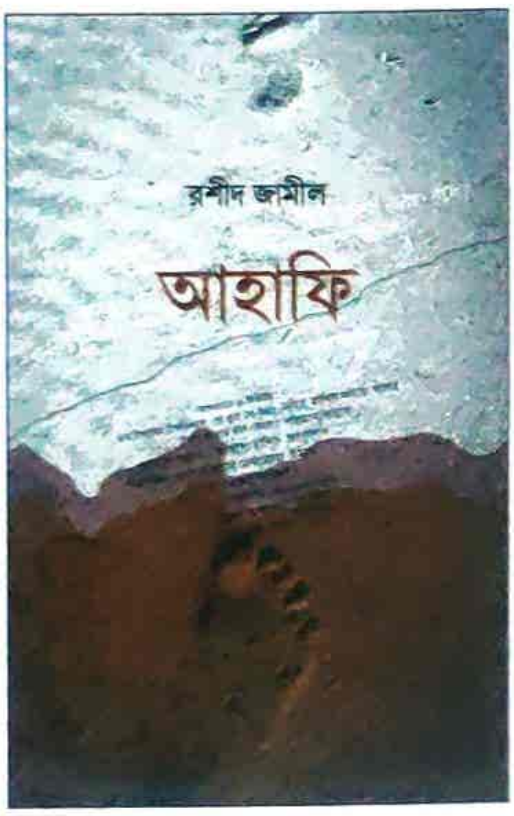

Ahafi
by Rashid Jamil
Kalantor Prokashoni
Price : ৳ ২৮০, US $ 13, UK £ 10
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
fb.com/kalantorprokashonisyl
www.kalantorprokashoni.com
অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

নতুন শতাব্দীকে বলা হচ্ছে প্রযুক্তির শতাব্দী। ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং মিডিয়ার সুবাদে নতুন সাজে পুরাতন এজেন্ডা বাস্তবায়নে ধর্মীয় ফিরকাবাজি উসকে দিচ্ছে কিছু লোক। এই কিছুদিন আগেও মুসলিমরা যখন মসজিদে নামাজে দাঁড়িয়েছেন, তখন ভুলে গেছেন বাইরের সব বিভেদ। কিন্তু আজ শুধু দুঃখ নয়; শঙ্কার সঙ্গে লক্ষ করছি, তথাকথিত সহিহ(!) আন্দোলনের কবলে পড়ে মুসলিমদের ঐক্যের প্রতীক নামাজসহ অন্যান্য ইবাদতও অনৈক্যের মহা-সম্মিলন হয়ে দাঁড়িয়েছে! তাদের সহিহ(!) আন্দোলনের শিকার সরলপ্রাণ তরুণসমাজ। লা-মাজহাবি সহিহ(!) আন্দোলনের কারণে আজ নামাজের কাতারে কাতারে ঝগড়া, ইমাম-মুসল্লিদের মধ্যে তর্ক, স্বামী-স্ত্রীতে বিবাদ এবং ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যেও সংঘাত!

সহিহওয়ালাদের এই অপপ্রচারের কবল থেকে মুসলিমদের ইমান-আকিদা রক্ষার জন্য আলিমরাসহ দলমত নির্বিশেষে সবাই এখন সচেতন হচ্ছেন। আলিমদের পক্ষ থেকে যথাযথ জবাবও দেওয়া হচ্ছে; কিন্তু ইসলামি বিধিবিধান-সংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলো সহজ-সরল উপস্থাপনের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানের উপযোগী করে রেফারেন্সসহ একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাব ছিল। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।